দাম : ষোলো টাকা

স্বস্তিকা

৭৬ বর্ষ, ৩০ সংখ্যা।। ১৫ এপ্রিল, ২০২৪।। ২ বৈশাখ, ১৪৩১।। যুগাব্দ - ৫১২৬।। নববর্ষ বিশেষ সংখ্যা।। website : www.eswastika.com

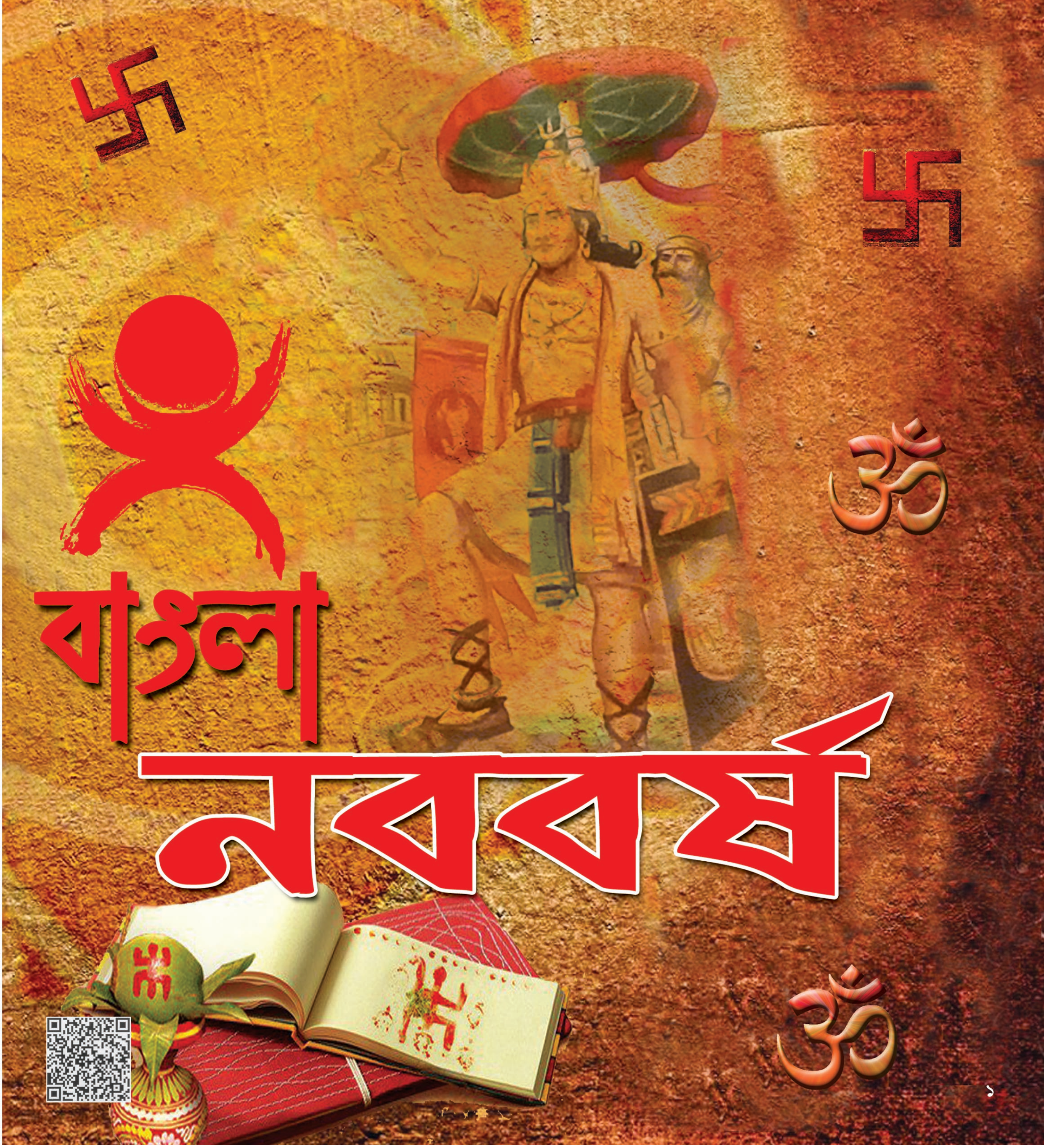

CENTURYPLY®

CENTURYPLY® CENTURYLAMINATES® CENTURYVENEERS®

CENTURYPRELAM® CENTURYMDF® CENTURYDOORS™

zykron FIBRE CEMENT BOARDS & PLANKS

STARKE NEW AGE PANELS

SAINIK PLYWOOD HAMESHA TAIYYAR

For any queries, SMS 'PLY' to 54646 or call us on 1800-2000-440 or give a missed call on 080-1000-5555

E-mail: kolkata@centuryply.com | CenturyPlyOfficial | CenturyPlyIndia | YouTube Centuryply1986 | Visit us: www.centuryply.com

স্বস্তিকা

।। বাংলা সংবাদ সাপ্তাহিক।।

নববর্ষ বিশেষ সংখ্যা

৭৬ বর্ষ ৩০ সংখ্যা, ২ বৈশাখ, ১৪৩১ বঙ্গাব্দ

১৫ এপ্রিল - ২০২৪, যুগাব্দ - ৫১২৬,

Website : www.eswastika.com

সম্পাদক : তিলক রঞ্জন বেরা

সহ সম্পাদক : সুকেশ চন্দ্র মণ্ডল

প্রচ্ছদ ভাবনা ও রূপায়ণ : অজিত কুমার ভকত

দূরভাষ :

সম্পাদকীয় : ৮৪২০২৪০৫৮৪ (W)

সার্কুলেশন : ৮৬৯৭৭৩৫২১৫

সার্কুলেশন হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪

বিজ্ঞাপন : ৯৩৩০৩৭৭৯২৩

দাম : ১৬ টাকা

বার্ষিক গ্রাহক মূল্য ৭০০ টাকা।

Postal Registration No.- KOL RMS/048/2022-2024

R N I No. 5257/1957

দূরভাষ : ২২৪১-০৬০৩

E-mail : swastika5915@gmail.com

vijoy.adya@gmail.com

Website : www.eswastika.com

শুভস্বস্তিকা প্রিন্টস ফাউন্ডেশন -এর পক্ষে প্রকাশক এবং মুদ্রক সারদা প্রসাদ পাল কর্তৃক ২৭/১বি, বিধান সরণি, কলকাতা-৬ থেকে প্রকাশিত এবং সেবা মুদ্রণ, ৪৩, কৈলাশ বোস স্ট্রীট, কলকাতা-৬ হতে মুদ্রিত।

সূচীপত্র

সম্পাদকীয় ◻ ৫

২৬৭ বার পলাশিতে সূর্যোদয় আর পশ্চিমবঙ্গে সূর্যাস্ত, 'উলটে দিলেই পালটে যাবে' ◻ নির্মাল্য মুখোপাধ্যায় ◻ ৬

চোর ধরলে পালটা পিটুনি ◻ সুন্দর মৌলিক ◻ ৭

দেশজুড়ে জোট রাজনীতির নতুন ধারা ◻ প্রদীপ সিংহ ◻ ৮

বাঙ্গালিয়ানার সঙ্গেই মিশে আছে হিন্দুত্ব ◻ বিশ্বামিত্র ◻ ১০

বাঙ্গালির পুনর্জাগরণের নতুন অধ্যায় হোক মহারাজা শশাঙ্ক ◻ প্রবীর ভট্টাচার্য ◻ ১১

বঙ্গাব্দ প্রবর্তনের কৃতিত্ব মহারাজা শশাঙ্কেরই ◻ ড. জিষ্ণু বসু ◻ ১৩

বঙ্গের নবজাগরণে কয়েকজন অনন্যার কথা, যাঁরা পথ দেখালেন ◻ ড. রাজলক্ষ্মী বসু ◻ ১৫

সিরাজ-উদ্-দৌল্লার পতনে বাঙ্গালি হিন্দু সেদিন রক্ষা পেয়েছিল ◻ প্রণব দত্ত মজুমদার ◻ ১৯

সাভারকর থেকে শ্যামাপ্রসাদ রাজনৈতিক হিন্দুত্বের ধারা ◻ তথাগত রায় ◻ ২৪

শাশ্বত ভারতের জাগ্রত বিবেক স্বামীজীর হিন্দুরাষ্ট্র ভাবনা ◻ অংশুমান গঙ্গোপাধ্যায় ◻ ২৬

বাঙ্গালির নববর্ষ ◻ কল্যাণ গৌতম ◻ ২৮

ভারতীয় সংস্কৃতির প্রাণপুরুষ শ্রীরাম ◻ গৌরী বন্দ্যোপাধ্যায় ◻ ৩১

কেমন ছিল রামায়ণের সময়ে অযোধ্যা ◻ ড. অনিল কুমার ঘোষ ◻ ৩৩

হিন্দু স্পর্ধার আলোকবর্তিকা পূর্ব ভারতের অগ্নিকুলগৌরব রায়শ্রেষ্ঠ মহারাজাধিরাজ ◻ তিলক সেনগুপ্ত ◻ ৩৫

স্বামী প্রণবানন্দ থেকে শ্রীগুরুজী : সাংস্কৃতিক জাতীয়তার ধারা ◻ রবি রঞ্জন সেন ◻ ৪৩

নিয়মিত বিভাগ :

অঙ্গনা : ২১ ◻ সুস্বাস্থ্য : ২২ ◻ নবাঙ্কুর : ৪০-৪১ ◻ সংবাদ প্রতিবেদন : ৪৭-৪৮

স্বস্তিকার সকল পাঠক-পাঠিকা, লেখক-লেখিকা, বিজ্ঞাপনদাতা ও শুভানুধ্যায়ীদের জানাই শুভ বাংলা নববর্ষের প্রীতি, শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন।

— স্বস্তিকা পরিবার

ফঃ ১

স্বস্তিকা

প্রকাশিত হবে ২২ এপ্রিল, ২০২৪

প্রকাশিত হবে ২২ এপ্রিল, ২০২৪

আগামী সংখ্যার আকর্ষণ

সামাজিক জীবনে মহাবীর শ্রীহনুমানের প্রভাব

নববিধা ভক্তিমার্গের একটি হলো দাস্য। এই দাস্যভাবের মূর্তিমান উদাহরণ হলেন মহাবীর শ্রীহনুমান। তিনি রুদ্রাবতার। হনুমান জয়ন্তী উপলক্ষ্যে স্বস্তিকার আগামী সংখ্যায় বীর হনুমানের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করবেন বিশিষ্ট গবেষক দুর্গাপদ ঘোষ, ড. কল্যাণ চক্রবর্তী, অধ্যাপক গোপাল চক্রবর্তী প্রমুখ।

বিজ্ঞপ্তি

স্বস্তিকার সকল গ্রাহক ও প্রচার প্রতিনিধিদের অনুরোধ করা যাচ্ছে যে, তাঁরা যেন তাঁদের দেয় টাকা নিম্নবর্ণিত ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে **NEFT**-র মাধ্যমে সরাসরি জমা দেন। যে কোনো ব্যাঙ্কের শাখা থেকে টাকা পাঠাতে পারেন।

স্বস্তিকার প্রচ্ছদে **QR code** ছাপানো হচ্ছে। এখানেও সরাসরি টাকা পাঠাতে পারেন।

টাকা পাঠিয়ে স্বস্তিকা দপ্তরে অবশ্যই জানাবেন।

ফোন : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪, ৮৬৯৭৭৩৫২১৫,

হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪

Account Name : **SUBHSWASTIKA PRINTS FOUNDATION**

A/C. No. : **103502000100693**

IFSC Code : **IOBA0001035**

Bank Name : **INDIAN OVERSEAS BANK**

Branch : **Sreemani Market Kolkata-700 006**

একটি বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

হিন্দু জাতীয়তাবোধের কণ্ঠস্বর সাপ্তাহিক স্বস্তিকা পত্রিকা অনেক চড়াই-উতরাই পেরিয়ে ২০২২ সালে পঁচাত্তর বর্ষে পদার্পণ করেছে। এই শুভ অবসরে আমরা স্বস্তিকার পাঠক ও শুভানুধ্যায়ীদের কাছে একটি বিশেষ আবেদন রাখছি। সাপ্তাহিক স্বস্তিকার আজীবন এবং দশ বছরের সদস্য হিসেবে নাম নথিভুক্ত করার সিদ্ধান্ত হয়েছে। আজীবন সদস্যতার জন্য ২৫,০০০ (পঁচিশ হাজার) টাকা এবং দশ বছরের সদস্যতার জন্য ১০,০০০ (দশ হাজার) টাকা ধার্য করা হয়েছে। সদস্যদের কাছে প্রতি মাসের শেষ সপ্তাহে চারটি/পাঁচটি সংখ্যা (বিশেষ সংখ্যা-সহ) এক সঙ্গে রেজিস্ট্রি ডাকযোগে পাঠানো হবে। সকল পাঠক ও শুভানুধ্যায়ীর নিকট বিনীত নিবেদন, তাঁরা যেন এই বিষয়টিকে গুরুত্ব দিয়ে বিবেচনা করেন এবং আমাদের পূর্ণ সহযোগিতা করেন।

সদস্যতার জন্য টাকা পাঠাবার নিয়ম ঃ—

স্বস্তিকা দপ্তরে টাকা জমা দিতে পারেন। সেক্ষেত্রে অবশ্যই চেক Subhswastika Prints Foundation -এই নামে দিতে হবে। এছাড়া সরাসরি অনলাইনে টাকা পাঠাতে পারেন। টাকা পাঠানোর সঙ্গে সঙ্গে আপনার পূর্ণ ঠিকানা পিন কোড সহ, ফোন নম্বর দিয়ে স্বস্তিকার সম্পাদকের নামে একটি চিঠি দিয়ে জানান। যাতে আপনার দেওয়া টাকার রশিদ ও স্বস্তিকা নিয়মিত আপনার ঠিকানায় পাঠানো সম্ভব হয়।

অনলাইনে টাকা পাঠানোর ঠিকানা—

Account Name : **SUBHSWASTIKA PRINTS FOUNDATION**

Bank A/c --- 103502000100693

IFSC -- IOBA0001035

Bank -- Indian Overseas Bank

Branch : Sreemani Market, Kolkata-700006.

জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী

সম্পাদকীয়

হিন্দুরাষ্ট্রাঙ্গভূতা

ভারতবর্ষ অতি প্রাচীন দেশ। সেই অতি প্রাচীনকালেই এই ভূখণ্ডে একটি রাষ্ট্রজীবন বিকশিত হইয়াছে। কত প্রাচীন তাহার কোনো লেখাজোখা নাই। প্রাচীনত্বের উল্লেখ করিতে স্বামী বিবেকানন্দ বলিয়াছেন, রোম যখন ভবিষ্যতের অন্ধকারে লুক্কায়িত ছিল, যখন আধুনিক ইউরোপীয়দের পূর্বপুরুষরা গভীর অরণ্যে অসভ্য অবস্থায় নিজেদের নীলবর্ণে রঞ্জিত করিত তখনও ভারতবর্ষ উন্নত সভ্যতার উত্তরাধিকারী ছিল। ইহাতেই তিনি ক্ষান্ত না হইয়া পুনরায় বলিলেন, ইতিহাস যাহার কোনো সংবাদ রাখে না, কিংবদন্তীও যে সুদূর অতীতের ঘনান্ধকারে দৃষ্টিপাত করিতে সাহস করিতে পারে না, তখনও সেই সদূর অতীত হইতেই ভারতবর্ষ শান্তি ও আশীর্বাদের বাণী লইয়া অগ্রসর হইতেছে। তাই যাহারা ভারতবর্ষকে নবীন রাষ্ট্র বলিতেছেন; বলিতেছেন ১৯৪৭ সালের পর হইতে এই রাষ্ট্র নির্মাণ হইতে শুরু করিয়াছে, তাহারা ইতিহাসকেই অস্বীকার করিতেছেন অথবা ভারতবর্ষের রাষ্ট্রজীবনের সন্ধান পান নাই। তাহারা রাজনৈতিক ভারতকে পশ্চিমি ধারণাজাত রাষ্ট্র বলিয়া ভুল করিতেছেন। বিশ্বের সর্বাপেক্ষা প্রাচীন সাহিত্য বেদের মধ্যে ভারতের রাষ্ট্রজীবনের উল্লেখ রহিয়াছে। সেখানে পরিষ্কার বলা হইয়াছে, জগৎ কল্যাণের জন্য আত্মজ্ঞানী ঋষিগণ ব্রত লইয়া কঠোর তপস্যা করিয়াছেন বলিয়াই রাষ্ট্র, রাষ্ট্রতেজ ও রাষ্ট্রশক্তি উৎপন্ন হইয়াছে। আর সেইজন্যই জ্ঞানীব্যক্তিরা সর্বদা ভক্তিভরে এই রাষ্ট্রের সেবা করিয়া থাকেন (অথর্ববেদ-১৯/৪১/১)। এখানে রাষ্ট্র শব্দটি সম্পূর্ণভাবে ভাববাচক বা সংস্কৃতিবাচক। দুর্ভাগ্যের বিষয় হইল, ভারতের তথাকথিত সেকুলারবাদী পণ্ডিতরা পশ্চিমের রাষ্ট্র ধারণার সহিত ভারতের রাষ্ট্রভাবনাকে গুলাইয়া ফেলিয়াছেন। পশ্চিমে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্য মিলিয়া তাহাদের রাষ্ট্র নির্মাণ হইয়া থাকে। তাই তাহাদের রাষ্ট্রের ভিত্তি সম্পূর্ণভাবে রাজনৈতিক। কিন্তু ভারতে রাষ্ট্রের ধারণা হইল সামাজিক ও সাংস্কৃতিক। ভারতে রাষ্ট্রজীবন বিকশিত হয় জন্মভূমির প্রতি মাতা-পুত্রের ন্যায় সম্পর্কের ভিত্তিতে। বেদে ইহারও উল্লেখ রহিয়াছে– 'মাতাভূমি পুত্রোঽহম্ পৃথিব্যাঃ' (অথর্ববেদ-১২/১/১২)। ভারতভূমিকে যাহারা মাতৃভূমি, পিতৃভূমি ও কর্মভূমি বলিয়া মনে করিয়াছে, ইহার পাহাড়-পর্বত, নদ-নদী, অরণ্য— প্রকৃতির সবকিছুতে যাহারা দেবত্ব আরোপ করিয়া কৃতজ্ঞ রহিয়াছে, তাহাদের লইয়াই এই রাষ্ট্রজীবন বিকশিত হইয়াছে। শুধুমাত্র ভূমিখণ্ড, সরকার, জনগোষ্ঠী ও সার্বভৌমত্ব থাকিলেই রাষ্ট্র নির্মাণ হয় না। রাষ্ট্র নির্মাণের অন্যতম শর্ত হইল যে সেই জনগোষ্ঠীকে একই সংস্কৃতিসম্পন্ন হইতে হয়। সমান পূর্বপুরুষ, সমান ইতিহাস, সমান পরম্পরা, সমান সংস্কৃতি, সমান শ্রদ্ধার কেন্দ্রবিন্দু, সমান জীবন লক্ষ্য, সমান সুখ-দুঃখ, সমান শত্রু-মিত্র ভাব, সমান আশা-আকাঙ্ক্ষাযুক্ত জনসমাজই ভারতরাষ্ট্রকে বিকশিত করিয়াছে। এই জনসমাজ সমগ্র বিশ্বে হিন্দু নামে পরিচিত। আসেতুহিমাচল এই রাষ্ট্রজীবনের পরিচিতি হইল হিন্দুরাষ্ট্র। তাই ভারত ও হিন্দু এবং ভারতীয়ত্ব ও হিন্দুত্ব এখানে সমার্থক হইয়া গিয়াছে। ভারতের সর্বোচ্চ আদালতও দ্ব্যর্থহীন ভাষায় জানাইয়াছে যে, হিন্দুত্ব ভারতের জীবনধারারই একটি নাম। ভারতীয় দর্শন, ভারতীয় সংস্কৃতি বলিতে হিন্দু দর্শন ও হিন্দু সংস্কৃতিকেই বোঝানো হইয়া থাকে। রাজনৈতিকভাবে হাজার বৎসর এই দেশ বিদেশিরা শাসন করিলেও ইহার রাষ্ট্রজীবন অক্ষুণ্ণ থাকিয়াছে।

বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র, ঋষি অরবিন্দ প্রমুখ মনীষী 'হিন্দু'-কে 'ধর্ম' না বলিয়া ভারতবর্ষের জাতি বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। এই ভূমিকে যাঁহারা জন্মভূমি, কর্মভূমি বলিয়া মনে করেন, উপাসনা পদ্ধতিতে ভিন্ন হইলেও তাঁহারা হিন্দু। তাঁহারা হিন্দুরাষ্ট্র জীবনের অঙ্গীভূত। বিদেশি ভাবধারায় জারিত রাজনৈতিক দলগুলি এই রাষ্ট্রজীবনের সন্ধান পায় নাই। তাহারা ভেদাভেদের রাজনীতি করিয়া হিন্দুরাষ্ট্রের বিকাশের পথে বাধা সৃষ্টি করিয়াছে। রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের সরসঙ্ঘচালক বারবার স্মরণ করাইয়া দিয়াছেন, ভারতভূমিতে বসবাসকারী প্রত্যেকেই হিন্দু তাহা যেকোনো উপাসনা পদ্ধতির হউক না কেন। আধুনিক গবেষণাতেও ইহা প্রমাণিত যে বিগত চল্লিশ হাজার বৎসর হইতে এই দেশে বসবাসকারী মানুষের ডিএনএ এক রহিয়াছে। সুখের বিষয় হইল, ভিন্ন উপাসনা পদ্ধতির অনুসারীরাও ইদানীং স্বীকার করিতে শুরু করিয়াছেন যে তাহারাও এই ভারতভূমির সন্তান, তাহারাও একদা হিন্দু ছিলেন। তাহারাও এখন নিজেদের এই হিন্দুরাষ্ট্রজীবনের অঙ্গীভূত বলিয়া স্বীকার করিতেছেন। রাজনীতির কারবারিরা ক্ষুদ্র রাজনীতির ঊর্ধ্বে উঠিয়া হিন্দু রাষ্ট্রজীবনকে স্বীকার করিয়া সেইরূপ আচরণ করিতে শুরু করিলে তাহা দেশ ও জাতির পক্ষে মঙ্গলজনক হইবে।

সুভাষিতম্

ভদ্রমিচ্ছন্ত ঋষয়ঃ স্বর্বিদঃ তপো দীক্ষাম উপাসেদুরগ্রে।
ততো রাষ্ট্রং বলমোজশ্চ জাতং তদস্মৈ দেবা উপসংনমন্তু।। (অথর্ববেদ-১৯/৪১/১)

জগতের কল্যাণ কামনায় আত্মজ্ঞানী ঋষিগণ প্রথম থেকেই ব্রত নিয়ে কঠোর তপস্যা করেছেন বলেই রাষ্ট্র, রাষ্ট্রশক্তি ও রাষ্ট্রতেজ উৎপন্ন হয়েছে। তাই বুদ্ধিমান লোকেরা বিনম্রভাবে রাষ্ট্রের সেবা করে থাকেন।

২৬৭ বার পলাশিতে সূর্যোদয় আর পশ্চিমবঙ্গে সূর্যাস্ত

‘উলটে দিলেই পালটে যাবে’

নির্মাল্য মুখোপাধ্যায়

সামনে থেকে নয়। ইতিহাস আমি পিছন থেকে পড়ি। ১৯৫২ সালে এশিয়াটিক সোসাইটি থেকে প্রকাশ পায় ‘বেঙ্গল নওয়াবস’ গ্রন্থ। বিখ্যাত ঐতিহাসিক স্যার যদুনাথ সরকার পলাশির যুদ্ধের প্রত্যক্ষ সাক্ষীদের লেখার আক্ষরিক অনুবাদ ও সম্পাদনা করেন। ড. মেঘনাদ সাহার অনুরোধে সেই কাজ হাতে নিয়েছিলেন। স্যার উইলিয়াম জোনস-এর ২০০ বছর উদ্‌যাপনের লক্ষ্যে সংকলিত হয় সেই গ্রন্থ। ১৯৪৫-এ গ্রন্থের অনুবাদ ও সম্পাদনা শুরু করেন স্যার যদুনাথ। ১৭৫৭-র ২০ জুন পলাশিতে এক ঘণ্টার সাজানো যুদ্ধে প্রত্যক্ষ সাক্ষীদের ফারসি লেখার ইংরেজিতে অনুবাদ করেন যদুনাথ। তাতে আলোর মতো উঠে আসে ঘরোয়া কোঁদল ও উচ্ছৃঙ্খল জীবনে আসক্ত নবাব সিরাজ-উদ- দৌল্লার ঘটনা। সনাতন হিন্দু ধর্ম বিরোধী, নারীলোলুপ, জেহাদি জীবন তাঁর। সেই খামখেয়ালি দুশ্চরিত্র নবাবকে পিছন থেকে ছুরি মারে তার সম্প্রদায়ের কিছু আস্থাভাজন। দেশ বা ভারতবর্ষ নয়, ব্যক্তিস্বার্থ, পরিবার, সম্পত্তি ও গদি রক্ষার জন্য পলাশিতে জেদের লড়াই চেয়েছিলেন মানুষ থেকে বিচ্ছিন্ন সিরাজ।

ঐতিহাসিক ড. রমেশচন্দ্র মজুমদার ‘অ্যাডভান্সড হিস্ট্রি অব ইন্ডিয়া’তে যথার্থ লেখেন, সিরাজের মধ্যে দেশপ্রেমের কোনো ভাবনাই ছিল না। তাই সিরাজকে দেশপ্রেমিক বলা মস্তবড়ো ঐতিহাসিক ভুল। মূর্খামিও বটে। সিরাজের কুকীর্তি নিয়ে ‘হীরাঝিলের কান্না’ নামে একটি গ্রন্থ আর নাটক চল্লিশ বা পঞ্চাশের দশকে জনপ্রিয় হয়। সিরাজের চরিত্রহীনতার সুযোগ নেয় নিম্নরুচির ইংরাজ রবার্ট ক্লাইভ। মুর্শি গোষ্ঠী তাকে সাহায্য করে। গোষ্ঠী প্রতিনিধিদের হেনস্থা করতেন সিরাজ। এদের অনেকেই হিন্দু। আর বেশিরভাগ মুসলমান। প্রতিশোধ নিতে তারা ক্লাইভকে ব্যবহার করে। হেরে গিয়ে ভগবানগোলা থেকে মালদা হয়ে পালায় সিরাজ। ঝাড়খণ্ডের রাজমহলে ধরা পড়ে। এক মুসলমান ফকির তাকে ধরিয়ে দেয়। বিশ ঘা চাবুকে মারা না গেলে এক অনামি মুঘল সৈনিক তাকে ছোরার আঘাতে খতম করে। মৃতদেহ হাতির পিঠে ফেলে মুর্শিদাবাদ শহরে ঘোরানো হয়। বাড়িতে নিয়ে গেলে সিরাজের মা হাতির নীচে প্রাণ দেবে বলে এগিয়ে আসে। তাকে ফিরিয়ে দেওয়া হয়।

তারপর ভরা বাজারের মধ্যে তার দেহ ফেলে দেওয়া হয়। কেউ কাছে ঘেঁষেনি। সামান্য প্রতিবাদ করেনি। সাধারণ মানুষের কাছে এতটাই ঘৃণ্য আর অপাংক্তেয় ছিল সিরাজ। মিরজা জাইনুল আবেদিল বাকোয়াল নামে এক বৃদ্ধ সিরাজের দেহ টেনে নিয়ে গিয়ে দাদু আলিবর্দি খাঁ-র কবরের পাশে কবর দেয়। শেষ হয় ১৫ মাসের ভয়াবহ রাজত্বকাল। এই ইতিহাস অনেকের অজানা তাই লিখলাম। বাঙ্গালি আবেগপ্রবণ। সিরাজকে দেশপ্রেমিক সাজাতে সদা ব্যস্ত। তা মস্ত ভুল। সিরাজকে নিয়ে বহু গ্রন্থ, যাত্রা, নাটক লেখা শুরু হয় স্বদেশি যুগ থেকে। ক্লাইভ ততদিনে আত্মহত্যা করেছে। অনৈতিহাসিকভাবে বাঙ্গালি সিরাজকে নায়ক বানিয়ে দেয়। একসময় ‘উলটে দেখুন পালটে গেছে’ বলে একটি ব্যবসায়িক স্লোগান বাজারে চালু ছিল। সিরাজের মতো পশ্চিমবঙ্গের ইতিহাসকে এবার পিছন থেকে পড়ার সময় এসেছে। সংশোধিত নাগরিক আইনের ভিতর দিয়ে ইতিমধ্যে মান্যতা পেয়েছে ওপার বাঙ্গলা থেকে চলে আসা মানুষের নাগরিক হওয়ার দাবি। ২০১৯-এর লোকসভা ভোটে তৃণমূল ২২ আর বিজেপি ১৮ আসন পায়।

> **কেন্দ্রীয় তদন্ত রুখতে মমতা বলতেন ভয় না পেয়ে মামলা করুন। এখন নিজেই ভয় পেয়ে ঘুরিয়ে বলছেন হামলা করুন।**

ইতিহাসকে পিছন থেকে পড়লে বর্তমান ও ভবিষ্যৎ ধরা যায়। সিরাজের জন্য যেমন তা সত্য, তৃণমূলের ক্ষেত্রেও তাই। ভোটের অঙ্কটা ওলটাতে চলেছে। বসিরহাটে আর কৃষ্ণনগরের বিজেপি প্রার্থীদের প্রধানমন্ত্রীর টেলিফোন তার প্রমাণ। রাজ্যের ৪৯ শতাংশ মহিলা ভোট বিজেপির অন্যতম প্রধান শক্তি। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বুঝতে পেরেছেন ইতিহাসের চাকা উলটো ঘুরছে। তাঁর রাজনৈতিক হিমোগ্লোবিনে লোহিতকণিকার চেয়ে শ্বেতকণিকার মাত্রা অনেকটা বৃদ্ধি পেয়েছে। তিনি রাজনৈতিক কর্কট রোগে আক্রান্ত। কেন্দ্রীয় তদন্ত রুখতে মমতা বলতেন ভয় না পেয়ে মামলা করুন। এখন নিজেই ভয় পেয়ে ঘুরিয়ে বলছেন হামলা করুন। তবে শেষ রক্ষা হবে না। বিশ্বাসঘাতক মিরজাফরের পায়ে নবাবি উষ্ণীষ রেখে সাহায্য চেয়েছিল সিরাজ। উলটে তাকে হত্যার পরিকল্পনা হয়। সিরাজ ছিল মানুষের থেকে বিচ্ছিন্ন। তাই সাহায্য পায়নি। মমতাও মানুষ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছেন। তাঁর সিরাজের দশা হতে বাধ্য।

গত সংখ্যায় রাজ্যপাট-এর লেখকের নাম মুদ্রণ বিভ্রাটে বাদ পড়ে গেছে। অনিচ্ছাকৃত ত্রুটির জন্য দুঃখিত।

—স্ব: স:

চোর ধরলে পালটা পিটুনি

বদলারূপেণ দিদি,

আচ্ছা দিদি, আপনি কি ইডি, সিবিআই, এনআইএ, আয়কর হানার ভয়ে রাতে ঘুমোতে পারছেন না? নিশ্চয়ই না। কারণ, আমি জানি আপনার নির্দেশ থাকলেও কোনও প্রমাণ আপনি রাখেননি। আচ্ছা, আপনার দলের যে মন্ত্রীরা এখন জেলে, তাঁদের সম্পর্কে আপনাদের মত কী? নিশ্চয়ই বলবেন না যে, ওঁরা ধোয়া তুলসীপাতা! আচ্ছা, যদিও আদালতের নির্দেশেই সব তদন্ত হচ্ছে তবু আপনারা বলছেন বিজেপি করাচ্ছে। কিন্তু এমন একজনের বিরুদ্ধেও ব্যবস্থা হয়েছে যাঁদের বিরুদ্ধে কোনও অভিযোগ নেই? বলতে, পারবেন যাঁকে ধরতে গিয়ে ইডি কর্তারা মার খেলেন সন্দেশখালিতে তিনি অতিশয় এক মহান ব্যক্তি? তা হলে দেরিতে হলেও, চাপে পড়েও রাজ্য পুলিশ কেন গ্রেপ্তার করল শ্রীশ্রী শেখ শাহজাহানকে? এনআইএ কর্তারা যাঁদের ধরতে গিয়ে মার খেলেন তাঁদের বিরুদ্ধে অভিযোগ কি অসত্য?

দিদি, ভূপতিনগরে ২০২২ সালের ২ ডিসেম্বর ঠিক কী হয়েছিল? মধ্যরাতে যা ঘটে তাতে বিস্ফোরণস্থল থেকে দেড় কিলোমিটার দূরে তৃণমূলের বুথ সভাপতি রাজকুমার মান্নার দেহ উদ্ধার হয়। তৃণমূল কর্মী বিশ্বজিৎ গায়েনের ঝলসানো দেহে মেলে আধ কিলোমিটার দূরে।

গ্রামবাসীরাই অভিযোগ করেছিলেন, ভগবানপুর-২ ব্লকে বরোজের নাড়ুয়াবিলা গ্রামে তৃণমূলের বুথ সভাপতির বাড়িতে বোমা বাঁধতে গিয়ে বিস্ফোরণ হয়। মোট ৩ জনের মৃত্যু হয়। প্রথমে নিহত রাজকুমারের স্ত্রী লতিকা রানি মান্না কিছুই জানেন না বলে দাবি করলেও একদিন বাদেই তিনি ভূপতিনগর থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করে জানান, পরিবারের সকলের নিষেধ সত্ত্বেও স্বামী বাড়িতে বাজি তৈরি করতেন। এর পরে স্বতঃপ্রণোদিত মামলা রুজু করে তদন্ত শুরু করে আপনার পুলিশ।

এই বারে আসা যাক আপনার বর্তমান দাবিতে। আপনি বলেছেন, তৎকালীন সময়ে নাকি চকোলেট বোমা পড়েছিল। রাজ্যের কোন কোম্পানি এমন চকলেট বোম বানায় জানেন? যা ফাটতেই তৃণমূলের তিন কর্মীর দেহ ছিটকে যায় এক দেড় কিলোমিটার দূরে! এবার তো এটা নিয়ে এনআইএ তদন্তের দাবি জানাতে পারে বিরোধীরা। এরাজ্যের সেই চকলেট বোম কারখানা কিংবা অন্য রাজ্য থেকে কোন পথে সেই বাজি ঢুকছে তার এনআইএ তদন্ত হওয়াই উচিত।

আর একটা কথা দিদি, আপনি বলছেন, বিজেপি সিবিআই, ইডি ব্যবহার করছে। আচ্ছা বলুন তো, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে তো সিবিআই জেরা করেছিল, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহকেও। কিন্তু বিজেপি তখন বলেছিল কি, রাজনৈতিক কারণে জেরা! বলেনি। প্লিজ বদলা নিতে উসকানি দেবেন না আর।

দিদি, বিভিন্ন সভায় কেন্দ্রীয় সরকারি বিভিন্ন সংস্থার অফিসার, কর্মী, কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ানদের বিরুদ্ধে যে ভাবে উসকানি দিয়ে চলেছেন সেটা কি ভাবা যায়? মুখ্যমন্ত্রীর মতো গুরুত্বপূর্ণ পদের পক্ষে এটা শোভা পায়?

আমার এক বিজেপি নেতার কথা মনে করাতে ইচ্ছা করছে। লালকৃষ্ণ আদবাণী। মনে আছে, ১৯৯৬ সালে হাওয়ালা কেলেঙ্কারিতে তাঁর নাম চক্রান্ত করে জড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল। আর আদবাণীজী সঙ্গে সঙ্গেই সাংসদ পদ ছেড়ে দিয়ে বলেছিলেন, নির্দোষ প্রমাণিত না হয়ে সংসদে ফিরবেন না। যাবতীয় তদন্তের মুখোমুখি হয়ে ক্লিনচিট পাওয়ার পরেই ১৯৯৮ সালে লোকসভা নির্বাচনের প্রার্থী হন।

আর এ রাজ্যের নতুন প্রজন্ম দেখছে, তিহার জেলে বসেও 'সততার প্রতীক' রাজনৈতিক দলের জেলা সভাপতি থাকা যায়। জেলে চলে গিয়েও মন্ত্রী থাকা যায়। খাদ্যমন্ত্রী গ্রেপ্তার হওয়ার মাস চারেক পরেও লাজলজ্জার মাথা খেয়ে মন্ত্রীসভায় ছিলেন। তবে বান্ধবী এবং কোটি কোটি টাকার পাহাড় নিয়ে গ্রেপ্তার পার্থ চট্টোপাধ্যায় দিন পাঁচেক কারাবন্দি মন্ত্রী ছিলেন। নারী-নির্যাতক শাজাহানও কয়েকটা দিন জেলে বসেই জেলা পরিষদের দায়িত্বে ছিলেন।

সামনে নির্বাচন। আমার অন্য চিন্তা হচ্ছে। কেন ভোট চুরি করতে দেওয়া হচ্ছে না তার জন্য ভোটকর্মীদের মার দেওয়া হতে পারে। কেন হেরে গেলাম তার জন্য গণনাকেন্দ্রের কর্মীদের গায়ে হাত তোলা হতেই পারে। আর হয়ে গেলেই আপনি তখন ভূপতিনগরের মতোই আক্রমণ-কারীদের ওপর নির্যাতনের অভিযোগ তুলে দেবেন। দিদি, বিভিন্ন সভায় কেন্দ্রীয় সরকারি বিভিন্ন সংস্থার অফিসার, কর্মী, কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ানদের বিরুদ্ধে যে ভাবে উসকানি দিয়ে চলেছেন সেটা কি ভাবা যায়? মুখ্যমন্ত্রীর মতো গুরুত্বপূর্ণ পদের পক্ষে এটা শোভা পায়?

আপনার এত ভালো ভাই হয়েও মানতে পারছি না। বড়ো কিছু হয়ে গেলে কে সামলাবে? ■

অতিথি কলম

দেশজুড়ে জোট রাজনীতির নতুন ধারা

প্রদীপ সিংহ

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর এই গঠবন্ধন বা জোট রাজনীতির প্রকৃত স্বরূপ কী? যেভাবে তিনি দেশজুড়ে কেন্দ্রীয় শাসক জোট ন্যাশনাল ডেমোক্র্যাটিক অ্যালায়েন্স বা এনডিএ-র বিস্তৃতি চাইছেন তাতে একটিই প্রশ্ন উঠে আসে যে, তিনি এই জোট রাজনীতির বিস্তার কেন চাইছেন? ২০২৪-এর সাধারণ নির্বাচনের ফলাফল সংক্রান্ত বিভিন্ন সমীক্ষায় আপাতত যেসব তথ্য উঠে এসেছে তাতে একটি বিষয় অত্যন্ত স্পষ্ট যে এনডিএ জোটের পক্ষে বার্তা অত্যন্ত সদর্থক। ভারতীয় জনতা পার্টির বিপক্ষে যেসব শক্তিশালী বিরোধী দল রয়েছে এবং যারা বিজেপির পূর্বতন ও বর্তমান সহযোগী তারাও এখনও পর্যন্ত প্রকারান্তরে মেনে নিয়েছেন যে নরেন্দ্র মোদী তৃতীয়বারের জন্য দেশের প্রধানমন্ত্রী পদে আসীন হতে চলেছেন। তাই আসন্ন লোকসভা ভোটের ফলাফল নিয়ে কোথাও কোনো শঙ্কা নেই। এটাও শোনা যাচ্ছে যে এবারের ফলাফল ২০১৯-এর লোকসভা ভোটে বিজেপির প্রাপ্ত আসন সংখ্যাকেও ছাপিয়ে যাবে। বিরোধীদের প্রশ্ন হলো, বিজেপির আসন এবার কতটা বাড়বে— কুড়ি অথবা চল্লিশ? বিজেপি অবশ্য দাবি করছে গতবারের থেকে অনেকটাই বেশি হবে। আশা করা হচ্ছে এনডিএ সব মিলিয়ে হয়তো ৪০০ আসনের লক্ষ্য অতিক্রম করে যাবে। দলের শীর্ষস্থানীয় নেতৃত্ব দলীয় কার্যকর্তাদের এই ধরনের লক্ষ্যমাত্রা দিয়ে থাকেন। কিন্তু নরেন্দ্র মোদী দেশের রাজনীতিকে বদলাতে চাইছেন। তিনি কার্যকর্তাদের জন্য এই লক্ষ্যমাত্রা দেননি। দেশের আপামর ভোটারদের জন্য তিনি এই লক্ষ্য নির্ধারণ করেছেন।

ভারতীয় জনতা পার্টির তরফে দলীয় কার্যকর্তাদের জন্য বিভিন্ন সময় নির্দিষ্ট লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারিত হয়। আবার নানা সময় তা পরিবর্তিতও হয়। কতগুলি আসনে বিজেপি জয়যুক্ত হতে পারে সেই পরিসংখ্যান কার্যকর্তাদের থেকে দল প্রত্যাশা করে না বা সেই সংখ্যাতত্ত্ব সংগ্রহ করে না। অমিত শা দলীয় সভাপতি ও উত্তরপ্রদেশের পর্যবেক্ষক হওয়ার পর একটি বৈঠকে উত্তরপ্রদেশের কার্যকর্তাদের বলেছিলেন যে আপনাদের উত্তরপ্রদেশের কোনো আসন জেতানোর কথা বলা হচ্ছে না। আপনারা এটা বলুন যে কে কোন বুথ জেতাতে পারবেন। এর অর্থ একদম তৃণমূল স্তরে যে কার্যকর্তা আছেন তার অবদান দলীয় সাফল্য অর্জনের ক্ষেত্রে সব চেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ। দলের প্রতি বুথ স্তরের এই কার্যকর্তাদের কন্ট্রিবিউশন সর্বাধিক তাৎপর্যপূর্ণ। এটি হলো সেই ভিত্তিপ্রস্তর যার উপর দলের ইমারত দণ্ডায়মান থাকে। 'এবার ৪০০ পার' বা ৩৭০ পারের লক্ষ্য কার্যকর্তাদের প্রতি নয়, দেশের সব ভোটারদের কাছে প্রেরিত একটি বার্তা বা লক্ষ্যমাত্রা। এই লক্ষ্যে পৌঁছনো তখনই সম্ভবপর হবে যদি দেশের নির্বাচকমণ্ডলী সঙ্গে থাকেন, যদি দেশবাসী সাক্ষী হতে চান বিকশিত ভারতের। এই লক্ষ্য জয় তখনই সম্ভব হবে যদি ভারতজননীর সম্মান ও মর্যাদা ছড়িয়ে পড়ে বিশ্বজুড়ে। এই লক্ষ্য তখনই সফল হবে যদি দেশের মানুষ চায় প্রধানমন্ত্রীর তরফে যেসব জনকল্যাণমূলক যোজনা দেশজুড়ে পরিচালিত হচ্ছে তা আরও দীর্ঘদিন ধরে অব্যাহত থাকুক।

এই লক্ষ্য তখনই পূরণ হবে যখন দেশের মধ্যে ঔপনিবেশিক মানসিকতায় আক্রান্ত যে সমস্ত পার্টি বেঁচে আছে বা ঔপনিবেশিকতার ভাবনাসম্পন্ন যে সংগঠনগুলি আছে, তারা আরও কমজোরি হবে। ভোটদানের মাধ্যমে দেশবাসীকে ভারতের ধর্ম, ভারতের সনাতনি সংস্কৃতির পুনঃস্থাপনে উদ্যোগী করে তুলতে উৎসাহদান প্রধানমন্ত্রীর লক্ষ্য। সরকার গঠিত হবে, সরকারের মেয়াদকাল শেষ হবে, পুনরায় নতুন সরকার তৈরি হবে— এই চক্রের আবর্তন চলতেই থাকবে। এগুলি সরকারে প্রতিষ্ঠিত রাজনৈতিক শক্তির কিছু আপাত লক্ষ্য মাত্র। কিন্তু প্রধানমন্ত্রীর আসল লক্ষ্যটি বৃহত্তর।

এবার চোখ রাখতে হবে প্রধানমন্ত্রীর গত দশ বছরের উন্নয়নমূলক কর্মসূচিতে। উল্লেখযোগ্য বিষয় হলো মুসলমান ভোটের যে রাজনীতি ভারতে ছিল সেটাকে তিনি সম্পূর্ণ ধ্বংস করে দিয়েছেন। মুসলমান ভোট যারা পাবে তাদেরই মিলবে দেশের শাসনভার— এই ধারণাকে তিনি নস্যাৎ করে দিয়েছেন। কিন্তু মুসলমানদের বিরুদ্ধে একটি শব্দ তিনি উচ্চারণ করেননি বা একটি কাজও তিনি কখনও করেননি। টিভি চ্যানেলে সম্প্রচারিত সংবাদ অনুযায়ী, প্রয়াগরাজ জেলায় হওয়া একটি সমীক্ষায় প্রকাশ যে একটি স্থানে প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনায় ৯৮টি বাড়ি তৈরি হয়েছে। তার মধ্যে ৯০টি বাড়ি মুসলমানদের। তাই ভারত সরকারের যোজনায় লাভবান মুসলমানদের পক্ষে এইসব যোজনার বিরোধিতা করা সম্ভব নয়। কেন্দ্রে সরকার গঠনের ক্ষেত্রে তারা বিজেপিকে ভোট নাও দিতে পারে, কিন্তু সরকারি নীতি প্রণয়ন এবং তার রূপায়ণ ধর্মীয়ভাবে প্রভাবিত— কারুর পক্ষে এই অভিযোগ তোলা অসম্ভব।

এই মুসলমান ভোটব্যাংকের রাজনীতি প্রয়োগ বন্ধ হওয়ার পর আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ হয়েছে। মুসলমানদের মনে বিজেপি সম্পর্কে যে আক্রমণাত্মক মনোভাব, যে ঘৃণার মানসিকতা ছিল— তা বহুলাংশে নিষ্প্রভ হয়েছে। মুসলমান জনগোষ্ঠীর সঙ্গে বাক্যালাপ করলে এই মুহূর্তে বিজেপি সম্পর্কে কোনো আক্রোশ বা ঘৃণার বহিঃপ্রকাশ তাদের তরফে ঘটবে না। কেন্দ্রীয় সরকার প্রণীত নীতির বিরোধিতা তাদের তরফে নেই। তারা এটা বলে থাকে যে বিজেপিকে তারা ভোট দেবে না, কিন্তু তারা এটাও মেনে নেয় যে কেন্দ্রে দশ বছর এবং উত্তরপ্রদেশে সাত বছর বিজেপি যে সরকার চালিয়েছে সেখানে সরকারি যোজনার সুযোগ-সুবিধাদানের ক্ষেত্রে কোনোরকম ধর্মীয়, ভাষাগত বা অন্য কোনো পক্ষপাতমূলক কাজ হয়নি। যার যা ন্যায্য প্রাপ্য, তা থেকে কেউ বঞ্চিত হয়নি। এর পরিণামে অনেকেই যারা এখনও সরকারি যোজনার সুবিধালাভ করেননি, তাদের বিশ্বাস জন্মেছে যে কেন্দ্রীয় সুশাসন অব্যাহত থাকলে তাদেরও একদিন ঘটবে সরকারি যোজনার সুবিধাপ্রাপ্তি। মানুষের বিশ্বাস ও ভরসার কেন্দ্রে রয়েছেন

নরেন্দ্র মোদী। অন্যরা সরকারি প্রকল্পের সুবিধা লাভ করলে একদিন আমরাও নিশ্চয়ই উপকৃত হবো এই বিশ্বাস জাগ্রত হয়েছে আজ ভারতবাসীর মনে। 'মোদী হ্যায় তো মুমকিন হ্যায়'— ভারতীয় জনগণের মনের এই বিশ্বাস প্রধানমন্ত্রীর শক্তির উৎস।

ওড়িশায় বিজু জনতা দলের নেতৃত্বে বিজেপি-বিরোধী রাজনৈতিক দলের সরকার হলেও তারা কেন্দ্রের সঙ্গে বজায় রেখেছে সহযোগিতার মনোভাব। অন্ধ্রপ্রদেশের তেলুগু দেশম পার্টি ও জনকল্যাণ পার্টি, কর্ণাটকে জেডিএস, বিহারের জনতা দল (ইউনাইটেড), উত্তরপ্রদেশের আরএলডি, আপনা দল এনডিএ-র অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। পঞ্জাবের অকালি দল আবার একসঙ্গে আসার চেষ্টা করছে। বিজেপি বিদ্বেষী রাজনীতিমুক্ত, কংগ্রেস-বিরোধী দলগুলিকে একসঙ্গে যুক্ত করার প্রয়াস চলছে। এটাই ভারতীয় রাজনীতির পট পরিবর্তনের সূচনা করতে চলেছে। বড়ো মাপের সর্বভারতীয় দল বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই রাজনৈতিক জোট গঠন করে নিরুপায় হয়ে। স্থানবিশেষে এটা তাদের দুর্বলতা বা আবশ্যকতার একটি লক্ষণ। যে রাজ্যগুলিতে সর্বভারতীয় দলটি কমজোরি এবং কোনো আঞ্চলিক দল শক্তিশালী, সেখানে জোট গঠনের প্রবণতা পরিলক্ষিত হয়। জোট রাজনীতির এই ধারণার বিপ্রতীপে বিজেপি প্রথমবার রাজনৈতিক জোটকে এমন এক রূপদান করতে চলেছে যেখানে বিভিন্ন রাজ্যে নিজেরা শক্তিশালী হওয়া সত্ত্বেও আঞ্চলিক বা রাজ্যভিত্তিক দলগুলিকেও জোটে আহ্বান ও অন্তর্ভুক্ত করছে। ত্রিপুরায় বিজেপি নেতৃত্বাধীন সরকারের সংখ্যাগরিষ্ঠতা থাকলেও তারা তিপ্রা মোথাকে এনডিএ-র অন্তর্ভুক্ত করেছে যারা ছিল প্রধান বিরোধী দল। এনডিএতে ত্রিপুরার ভূমিপুত্র জনজাতিগোষ্ঠীর প্রতিনিধিত্বকারী দল— তিপ্রা মোথার অন্তর্ভুক্তিতে ত্রিপুরার জনজাতি সমাজের কাছে পৌঁছে যায় একটি সদর্থক বার্তা। এই দলের সঙ্গে রাজনৈতিক বিরোধ থাকা সত্ত্বেও এই সরকার যে জনজাতিদের প্রতিনিধিত্বকারী দলের প্রতিপক্ষ নয়, জনজাতিদের জন্য ত্রিপুরা সরকার যে চিন্তাভাবনা ও কাজ করে চলেছে এই বার্তা দিয়ে জোট রাজনীতির এক নতুন দিশা দেখাচ্ছেন নরেন্দ্র মোদী। 'রাজনৈতিক চাহিদা'-ভিত্তিক নয়, এটা 'মতাদর্শ-ভিত্তিক' রাজনীতি। ২০১৯ সালে বিজেপির একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা থাকা সত্ত্বেও এনডিএ-র অন্তর্ভুক্ত সহযোগী দলগুলির নেতৃত্ব কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভায় স্থান পেয়েছে। ২০১৯ সালের বিহার বিধানসভা নির্বাচনে বিজেপি সবচেয়ে বেশি আসন পাওয়া সত্ত্বেও জোটের তরফে জনতা দল (ইউনাইটেড) নেতা নীতীশ কুমারকেই মুখ্যমন্ত্রী মনোনীত করা হয়। এবার এর বিপরীত ধারাটিকে লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে জহরলাল নেহরুর আমল থেকেই কংগ্রেস দল এই ধরনের জোট গঠনের বিরোধী। এর ফলে বিভিন্ন সময় কংগ্রেস দল ভাঙনের মুখে পড়েছে। ড. রাম মনোহর লোহিয়া, জয়প্রকাশ নারায়ণ, আচার্য কৃপালানী, পুরুষোত্তম দাস ট্যাণ্ডনের মতো বরেণ্য নেতৃত্ব কংগ্রেস দল ত্যাগ করেন। কংগ্রেসের সঙ্গে বিচারাধারাগত বিরোধ, সংঘাত, কংগ্রেসের শীর্ষ নেতৃত্বে পরিবারতন্ত্র কায়েম হওয়া— এই রাজনৈতিক পদ্ধতির সঙ্গে তৎকালীন জাতীয়তাবাদী শীর্ষ নেতৃত্ব নিজেদের খাপ খাওয়াতে পারেননি। ফলে বারবার ভাঙনের মুখে পড়েছে কংগ্রেস। শুরু থেকেই জোট রাজনীতির বিরুদ্ধে ছিল কংগ্রেস। ১৯৯৮ সালে সভানেত্রী সোনিয়া গান্ধীর নেতৃত্বে পাঁচমারি চিন্তন শিবিরের রেজোলিউশনে অন্য আঞ্চলিক দলগুলির সঙ্গে সমঝোতা না করার সিদ্ধান্ত নেয় কংগ্রেস। কিন্তু তারপরেও এই পরিকল্পনা-বহির্ভূত প্রক্রিয়ায়, রাজনৈতিক বাধ্যবাধকতায় ২০০৪ সালে ইউপিএ-নামক রাজনৈতিক জোট গড়ে কেন্দ্রে সরকার গঠন করে কংগ্রেস। কংগ্রেসের এহেন একাধিক দ্বিচারিতা এবং জাতীয়তাবাদী চিন্তাধারার অন্য দলগুলির প্রতি বিজেপির সদর্থক ও সহযোগিতার মনোভাবের কারণে কংগ্রেসকে জোট রাজনীতির বিপক্ষে এবং বিজেপিকে এই রাজনীতির পক্ষে বলে মনে করে রাজনৈতিক মহল। নরেন্দ্র মোদীর এই পারস্পরিক সহযোগিতার রাজনীতির গুণে যারা আগামীদিনে দেশের উন্নয়নযজ্ঞে শামিল হতে চাইছেন তারা সবাই এনডিএতে স্বাগত। আর ২৬টি দলের ইন্ডিজোট, যার মধ্যে অধিকাংশই চরম দুর্নীতিগ্রস্তপরিবারতান্ত্রিক দল, তাদের এই সুবিধাবাদী, সুযোগ-সন্ধানী, দেশবিরোধী জোটের কোনো রাজনৈতিক স্থিরতা ও নিশ্চয়তা নেই। তাই ২০২৪ সালের লোকসভা নির্বাচনের ফলাফল ঘোষিত হওয়ার পর ভারতের বুকে নতুন একটি রাজনৈতিক ধারা তৈরি হতে চলেছে, যা প্রকৃত অর্থেই দেশের রাজনীতির গতি-প্রকৃতিকে এক অন্য স্তরে নিয়ে যাবে, এক নতুন আঙ্গিক সৃষ্টি করবে। জোট রাজনীতির নতুন রূপে সংজ্ঞায়িত করতে চলেছেন নরেন্দ্র মোদী, যা বিরোধী দলগুলির ধারণার অতীত। রাজনৈতিক জোটের এই নয়া পরিভাষা দেশের মানুষও গ্রহণ করতে শুরু করেছে, যার আভাস ২০২৪-এর নির্বাচনের আগে থেকেই দেশজুড়ে পাওয়া যাচ্ছে।

(লেখক 'আপ কা আখবার'-এর সম্পাদক)

With Best Compliment :-

Promising Exports Ltd.

শোক সংবাদ

কলকাতা দক্ষিণ-পূর্ব বিভাগের বাঘাযতীন ভাগের সম্পর্ক প্রমুখ শিব সদয় রায়ের মাতৃদেবী আনন্দময়ী রায় গত ৮ মার্চ পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৩ বছর। তিনি ৩ পুত্র, ২ কন্যা ও নাতি-নাতনিদের রেখে গেছেন। তাঁদের মালদহ জেলার বামনগোলা খণ্ডের দীঘলবর গ্রামের বাড়িতে বহু স্বয়ংসেবক ও প্রচারক গেছেন। তারা সবাই এই মায়ের আশীর্বাদ পেয়েছেন।

বাঙ্গালিয়ানার সঙ্গেই মিশে আছে হিন্দুত্ব

বাঙ্গালিয়ানা আর হিন্দুত্বের মধ্যে অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক। এই কথা যদি বলা হয়, তবে শুনতে কেমন যেন ঠেকতে পারে! কিন্তু বাস্তব হলো এটাই সত্যি। কমিউনিস্ট ঐতিহাসিকরা রাজনৈতিক পরিস্থিতির সুযোগ নিয়ে আমাদের মনে এই ধারণা বদ্ধমূল করে দিয়েছে যে হিন্দুত্বের সঙ্গে বাঙ্গালিয়ানার কোনো সম্পর্ক নেই। হিন্দুত্ব জিনিসটা উত্তর ভারত থেকে আমদানিকৃত এবং বাঙ্গালি এর সঙ্গে দূরত্ব বজায় রাখলেই বিশুদ্ধ বাঙ্গালিত্ব রক্ষা পাবে। তাদের এহেন বক্তব্যের সঙ্গে স্বামী বিবেকানন্দ কিংবা ঋষি অরবিন্দকে কোনোমতেই খাপ খাওয়াতে পারবে না বুঝেই, বামপন্থীরা এই দুই মহামানবের যাবতীয় কৃতিত্বকে এতকাল অস্বীকার করে এসেছে। এখন আবার রাজনৈতিক পরিস্থিতি বেকায়দায় বুঝে 'হিন্দু ভালো, কিন্তু হিন্দুত্ব সাম্প্রদায়িকতা' এই তত্ত্ব বানানোর চেষ্টা চলছে। 'হিন্দুত্ব' বাঙ্গালিয়ানার সঙ্গে যায় না, এই ধরনের কথাবার্তা কতদূর অনৈতিহাসিক তা নীচের আলোচনাতেই বোঝা হবে।

হিন্দুত্ববাদের প্রবক্তা হিসেবে বিনায়ক দামোদর সাভারকরের নাম সর্বজনপরিচিত হলেও ইদানিংকালের ইতিহাসবিদদের সৌজন্যে আমাদের জানা, সাভারকরের 'হিন্দুত্ব' শব্দটি ব্যবহারের অন্তত তিন দশক আগেই এক বাঙ্গালি চিন্তাবিদ ১৮৯২ সালে হিন্দুত্বের ওপর বই লিখে আলোড়ন ফেলে দিয়েছিলেন। তাঁর নাম চন্দ্রনাথ বসু, তাঁর বইয়ের শিরোনামও 'হিন্দুত্ব'। ঐতিহাসিকেরা স্বীকার করেন যে, চন্দ্রনাথ বসুর এই বইই 'হিন্দুত্বে'র আদর্শগত বিচারধারাকে একসূত্রে বেঁধে দিয়েছিল এবং পরবর্তীকালে এই আদর্শের প্রেরণাতেই তিনি 'হিন্দুত্বে'র আদর্শগত রূপ দিয়েছিলেন। শুধু তাই নয়, হিন্দুদের রাজনৈতিক দাবি-দাওয়া আদায়ের জন্য ১৯৩৭ সালে সাভারকর একটা রাজনৈতিক দলে যোগ দেন, যার নাম হিন্দু মহাসভা।

এ ব্যাপারেও কিন্তু পথ-প্রদর্শক এক বাঙ্গালি, তাঁর নাম রাজনারায়ণ বসু। যিনি সম্পর্কে ঋষি অরবিন্দের মাতামহ এবং জাতীয়তামুখী নানান কর্মকাণ্ডের জন্য তিনি ভারতীয় জাতীয়তার পিতামহের আখ্যায় ভূষিত। ১৮৮৬ সালে তিনি 'ওল্ড হিন্দুজ হোপ' নামে একটি পুস্তিকা রচনা করেন, বাঙ্গলায় যার তর্জমাও হয় 'বৃদ্ধ হিন্দুর আশা' নামে। এই পুস্তিকায় তিনি হিন্দুদের জন্য একটি মহাসমিতি গঠনের প্রয়োজনীয়তার কথা বলেছিলেন। তা তখনই বিভিন্ন কারণে বাস্তবায়িত না হলেও পরে রাজনারায়ণের সেই স্বপ্নই চূড়ান্ত আকার ধারণ করে হিন্দু মহাসভা গঠনের মাধ্যমে। রাজনারায়ণের এই রচনাটি তাঁর পরিণত বয়সের রচনা। বলা বাহুল্য, পরিণত বয়সে তাঁর এই উপলব্ধি এসেছিল, যৌবনে হিন্দুত্বের কর্মকাণ্ডের মধ্য দিয়ে। মেদিনীপুরে তিনি যে জাতীয় গৌরবেচ্ছা সঞ্চারিণী সভা স্থাপন করেছিলেন, যার অনুপ্রেরণায় এক বীর বাঙ্গালি নবগোপাল মিত্র হিন্দু মেলা নামে একটি মেলার সূচনা করেন।

> **রামমোহন-বিদ্যাসাগর সমাজ-সংস্কারে যে সকল দূরদর্শী পদক্ষেপ নিয়েছিলেন, সেখানেও হিন্দু শাস্ত্রের বচনকেই তাঁরা হাতিয়ার করেছিলেন। তাঁদের জীবন ও মনীষায় বাঙ্গালি মনীষারা এভাবেই হিন্দুত্বের জয়গাথা গেয়ে গিয়েছেন। এরপরও বামপন্থী তার্কিকরা যদি বলেন, হিন্দুত্ব বাঙ্গালির নিজস্ব নয়, বাইরে থেকে আমদানি করা, তবে সেটা কী সত্যের অপলাপ হয় না?**

ব্রিটিশ শাসনাধীন ভারতবর্ষে সেই প্রথম হিন্দুত্বের সার্থক উদ্‌যাপন হয়েছিল, যা মাতিয়ে দিয়েছিল কলকাতা তো বটেই, মফস্সলের বাঙ্গালিদেরও। এর মাঝে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সভাপতিত্বে ন্যাশনাল সোসাইটির এক অনুষ্ঠানে রাজনারায়ণ বসু 'হিন্দুধর্মের শ্রেষ্ঠতা' শিরোনামে একটি বক্তৃতায় আসর মাত করে দেন। তাঁর বক্তৃতা শুনতে সেদিন হল উপচে পড়েছিল বাঙ্গালির ভিড়ে। বাঙ্গালি আদর্শগতভাবে হিন্দুত্বের রসদ সংগ্রহ করেছিল ঋষি বঙ্কিমচন্দ্রর আনন্দমঠ উপন্যাস ও সেই উপন্যাসের অন্তর্ভুক্ত বন্দেমাতরম্ সংগীত থেকে। বঙ্কিমচন্দ্রর বিভিন্ন উপন্যাসের পাশাপাশি সমকালীন আরও এক বিশিষ্ট বাঙ্গালি ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের অনেক রচনায় বিশেষ করে তাঁর 'স্বপ্নলব্ধ ভারতবর্ষের ইতিহাস'-এ হিন্দুত্বের আদর্শেরই জয়গাথা রচনা করেছিলেন। সেই সময়ই বিতর্ক সত্ত্বেও আরেকজন বাঙ্গালি তাত্ত্বিক শশধর তর্কচূড়ামণিও বাঙ্গালির মধ্যে হিন্দুত্বের আদর্শকে অনুপ্রবিষ্ট করিয়ে দিয়ে গিয়েছিলেন। একথাও আমাদের মনে রাখতে হবে, রামমোহন-বিদ্যাসাগর সমাজ-সংস্কারে যে সকল দূরদর্শী পদক্ষেপ নিয়েছিলেন, সেখানেও হিন্দু শাস্ত্রের বচনকেই তাঁরা হাতিয়ার করেছিলেন। তাঁদের জীবন ও মনীষায় বাঙ্গালি মনীষীরা এভাবেই হিন্দুত্বের জয়গাথা গেয়ে গিয়েছেন। এরপরও বামপন্থী তার্কিকরা যদি বলেন, হিন্দুত্ব বাঙ্গালির নিজস্ব নয়, বাইরে থেকে আমদানি করা, তবে সেটা কি সত্যের অপলাপ হয় না? □

বাঙ্গালির পুনর্জাগরণের নতুন অধ্যায় হোক

মহারাজা শশাঙ্ক

প্রবীর ভট্টাচার্য্য

একটা প্রবাদ আছে, যে জাতির রাজা নেই, সে জাতির ইতিহাস নেই। ভারতবর্ষে ভাষিক পরিচয়ধারী বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর মধ্যে বাঙ্গালি অন্যতম। অথচ বিগত কয়েক বছরের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যাচ্ছে— ক্রমশই গুরুত্ব হারাচ্ছে বাঙ্গালি! শিক্ষা, সাহিত্য, সংস্কৃতি, অর্থনীতি সব কিছুতেই পশ্চাদপদ বাঙ্গালি! অষ্টাদশ শতকে বাঙ্গালির নবজাগরণের মধ্যে দিয়ে নব্যভারতের অভ্যুত্থান। সেই বাঙ্গালির আজ এই দৈন্য অবস্থার বিশ্লেষণ প্রয়োজন।

১২৮১ বঙ্গাব্দে বঙ্গদর্শন পত্রিকায় প্রকাশিত 'বাঙ্গলার ইতিহাস'-এ বঙ্কিমচন্দ্র লেখেন; 'সাহেবেরা যদি পাখি মারিতে যান, তাহারও ইতিহাস লিখিত হয়, কিন্তু বাঙ্গলার ইতিহাস নাই। গ্রিনল্যান্ডের ইতিহাস লিখিত হইয়াছে, মাওরি জাতির ইতিহাসও আছে, কিন্তু যে দেশে গৌড়, তাম্রলিপ্ত, সপ্তগ্রামাদি নগর ছিল, যেখানে নৈষধচরিত, গীতগোবিন্দ লিখিত হইয়াছে, যে দেশ উদয়নাচার্য্য, রঘুনাথ শিরোমণি ও চৈতন্যদেবের জন্মভূমি, সে দেশের ইতিহাস নাই।' এই বক্তব্যে লেখকের আক্ষেপের সুর স্পষ্ট।

এই বক্তব্যের বছর ছয়েক পরে বঙ্গদর্শনের ১২৮৭ বঙ্গাব্দের অগ্রহায়ণ সংখ্যায় বঙ্কিমচন্দ্র আবারও জানাচ্ছেন : 'বাঙ্গলার ইতিহাস চাই। নহিলে বাঙ্গালি কখনো মানুষ হইবে না। যাহার মনে থাকে যে, এ বংশ হইতে কখনও মানুষের কাজ হয় নাই, তাহা হইতে কখনও মানুষের কাজ হয় না। তাহার মনে হয়, বংশে রক্তের দোষ আছে। তিক্ত নিম্ববৃক্ষের বীজে তিক্ত নিম্বই জন্মে— মাকালের বীজে মাকালই ফলে। যে বাঙ্গালিরা মনে জানে যে, আমাদিগের পূর্বপুরুষ চিরকাল দুর্বল--- অসার, আমাদিগের পূর্বপুরুষদিগের কখনো গৌরব ছিল না, তাহারা দুর্বল, অসার, গৌরবশূন্য ভিন্ন অন্য অবস্থা প্রাপ্তির ভরসা করে নাই, চেষ্টাও করে নাই। চেষ্টা ভিন্ন সিদ্ধও হয় না।' দ্বিতীয় প্রবন্ধটিতে বঙ্কিমচন্দ্র এই প্রসঙ্গে বলেছেন : 'বাঙ্গলার ইতিহাস চাই, নহিলে বাঙ্গলার ভরসা নাই। কে লিখিবে? তুমি লিখিবে, আমি লিখিব, সকলেই লিখিবে। যে বাঙ্গালি, তাহাকেই লিখিতে হইবে।'

> বাঙ্গালিকে যদি আজ নিজের স্বাভিমানে বেঁচে থাকতে হয়, তবে ফিরে তাকাতে হবে অতীত গৌরবে। শুরু করতে হবে বীরত্বের ইতিহাস। বাঙ্গালিয়ানার প্রবর্তক মহারাজাধিরাজ শশাঙ্ক। বাংলা নববর্ষ শুরু হোক শশাঙ্ক চর্চা দিয়েই। উদ্‌যাপন হোক মহারাজা শশাঙ্কের প্রতিশ্রুতি এবং তাঁর জয়ঘোষ দিয়ে।

প্রশ্ন এখানে বাঙ্গালি কে? কে লিখবে বাঙ্গালির সঠিক ইতিহাস! স্বাধীনতার পর বঙ্গভাগ হওয়ায় বাঙ্গালি জাতিসত্তাও ভাগ হলো নাকি চুরি হয়ে গেল এই মীমাংসায় আসা প্রয়োজন। ইসলামি আগ্রাসনে নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয় ধ্বংস হওয়ায় পূর্বভারতের গৌরবের কাহিনি অধিকাংশ অজানা। পাঠ্যসূচিতে যা স্থান পেয়েছে, সে তো হানাদার, লুঠেরা ও আক্রমণকারীদের ইতিহাস। কিন্তু বীর, বীরাঙ্গনা বাঙ্গালির অভাব ছিল না। অভাব ছিল না তাদের অসামান্য শৌর্য-বীর্যের কাহিনির। অভাব কেবল তা লিপিবদ্ধ করার।

ষষ্ঠ শতক ধরে এগিয়ে চললে গৌড়াধিপতি মহারাজা নরেন্দ্র আদিত্য শশাঙ্ক, গৌড়েশ্বর পরম ভট্টারক ধর্মপাল, গৌড়েশ্বর পরম ভট্টারক দেবপাল, মহারাজা বল্লালসেন, মহারাজা লক্ষণ সেন, রাজা পৃথুদেব রায়, রাজা চন্দ্রনাথ, উজানীপতি বিক্রমজিৎ ঘোষ, পঞ্চ গৌড়েশ্বর গণেশনারায়ণ ভাদুড়ী, রায়বাঘিনী মহারাণী ভবশঙ্করী, মহারাজ বীর হাম্বীর মল্লদেব, রায়শ্রেষ্ঠ মহারাজা প্রতাপাদিত্য, চাঁদ রায়, কেদার রায়, কর্ণগড়েশ্বরী রানি শিরোমণি প্রভৃতির বীরত্বপূর্ণ অসামান্য কাহিনিগুলি যদি তুলে ধরা যায়, তবেই বাঙ্গালি উপলব্ধি করতে পারবে কোন বীরবংশজাত তারা।

মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী নেপাল থেকে উদ্ধার না করলে বাঙ্গালির ভাষার ইতিহাসও অজানাই থাকত। কিন্তু সে ইতিহাসও অন্তত দেড়হাজার বছরের প্রাচীন। চর্যাপদের আর্যদেব ভিযুকু পা, ডেণ্ডা পা, ডম্বি পা, ক্ষণা পা, কুককরি পা, লুই পা, মীনা পা, সরহ পা, সবরী পা-এর

ফঃ ২

উত্তরসূরী জয়দেব, চণ্ডীদাস, কৃত্তিবাস, মালাধর বসু, রায়গুণাকর ভারতচন্দ্র, নরহরি চক্রবর্তীর মতো প্রণম্য কবিকুলের সাহিত্য এখন অধরা। ২০০৪ সালে রাজ্যসভায় প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে যখন দেশের ভাষার প্রাচীনত্বের মাধ্যমে তাকে শাস্ত্রীয় আখ্যা দেওয়া হচ্ছিল— যার ফলশ্রুতিতে ভারতে সংস্কৃত ছাড়াও তামিল, তেলুগু, মালয়ালম, কন্নড় ও ওড়িয়া ভাষা শাস্ত্রীয় বলে বিবেচিত হয়েছে, সেই সময়ে বাঙ্গালি সাংসদদের এবং রাজ্য সরকারের উদাসীনতা আমাদের অনেক প্রশ্নের সম্মুখে ফেলে দেয়।

তাহলে কি এক বৃহৎ ষড়যন্ত্রের শিকার পূর্বভারতের এই বৃহত্তম বাঙ্গালি জনগোষ্ঠী? ষষ্ঠ শতকে গুপ্ত বংশীয় এক যুবক বাঙ্গলার বিভিন্ন জনপদ ঐক্যবদ্ধ করে স্বাধীন সার্বভৌম্য নৃপতি হন। তিনিই গৌড়াধিপতি মহারাজাধিরাজ শশাঙ্কদেব। তিনি বাঙ্গলার নিজস্ব শাসন পদ্ধতি— গৌড়তন্ত্রের প্রচলন করেন, যা পৃথিবীর প্রাচীন সংবিধান হিসেবে গ্রহণযোগ্য। ষষ্ঠ শতকের গৌড় জনপদের শাসক হিসেবে তিনি পশ্চিমে বারাণসী থেকে পূর্বে গাঙ্গেয় ব-দ্বীপ সংলগ্ন জনপদ এবং দক্ষিণে কলিঙ্গের ভুবনেশ্বর ও গঞ্জাম পর্যন্ত বিস্তৃত এক বিশাল গৌড় সাম্রাজ্য স্থাপন করেন।

নরেন্দ্রাদিত্য শশাঙ্ক গৌড় সিংহাসনে আরোহণের পর পূর্ব ভারত থেকে মৌখরিদের বিতাড়িত করে মগধ জয় করেন এবং মগধে গৌড় সাম্রাজ্যের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করেন। মালবের গুপ্ত বংশীয় রাজা দেবগুপ্তের সঙ্গে জোট করে তিনি স্থানেশ্বরের পুষ্যভূতিবংশীয় রাজা রাজ্যবর্ধনকে সম্মুখযুদ্ধে পরাজিত ও নিহত করেন। এই ঘটনার পর রাজ্যবর্ধনের কনিষ্ঠ ভ্রাতা স্থানেশ্বরের সিংহাসনে আরোহণকারী ষষ্ঠদশ বর্ষীয় হর্ষবর্ধন বিপুল সৈন্যবাহিনী নিয়ে গৌড় ভুজঙ্গ শশাঙ্কদেবকে শাস্তি দিতে অগ্রসর হন এবং গৌড়ের পূর্বসীমানায় প্রতিবেশী কামরূপরাজ ভাস্করবর্মার সঙ্গে মৈত্রীজোট গড়ে তোলেন। কিন্তু গৌড়াধিপ শশাঙ্কদেবের শৌর্যের কাছে পরাস্ত হয়ে তারা পশ্চাদপসারণে বাধ্য হন এবং নিজের পিতার নামে কর্ণসুবর্ণে রাজধানী স্থাপন করে সম্রাট শশাঙ্কদেব শৌর্য বীর্যের সঙ্গেই তাঁর রাজ্য শাসন অব্যাহত রাখেন।

এই কর্ণসুবর্ণ থেকেই বাঙ্গালির অঙ্গুলিহেলনে পরিচালিত হতো বিশাল গৌড় সাম্রাজ্য। নিজের রাজত্বকালকে স্মরণীয় করে রাখতে মহারাজা শশাঙ্ক প্রাচীন সূর্যসিদ্ধান্ত অনুসারে তৈরি করেছিলেন এক কালপঞ্জিকা 'বঙ্গাব্দ'। বাঙ্গালির নিজস্ব কালপঞ্জি। ভারতবর্ষে শুধুমাত্র বাঙ্গালিরই আছে নিজস্ব এই অব্দ। খেয়াল করে দেখলে বিগত কয়েক বছর ধরে বাঙ্গালির এই বর্ষপঞ্জিকা 'বঙ্গাব্দ'কে ভিত্তি করে এক দুরভিসন্ধি প্রচার চলছে— এটি নাকি মুঘল বাদশা আকবরের প্রবর্তিত। চোদ্দশো বছরেরও বেশি সময় পার করে দেওয়া একটি হিন্দু বর্ষপঞ্জিকা মাত্র পাঁচশো বছরের প্রাচীন রাজার সময়কালে কী করে হয়? —এ প্রশ্নের যথাযথ উত্তর নেই! মধ্য যুগের নবাবি আমলেই বাঙ্গালির ভাষা সংস্কৃতির প্রকৃত চেহারা পায়— শুরু হয়ে গেছে এই মিথ্যা প্রচারের।

আশির দশক থেকেই সম্ভবত কোনও ভিন দেশীয় প্ররোচনায় পশ্চিমবঙ্গ বাংলা অ্যাকাডেমির উৎসাহে শুরু হয়ে যায় বাংলা বানানের সংস্কার প্রক্রিয়ার। বেছে বেছে প্রাকৃত শব্দ বাদ দেওয়া, যুক্তাক্ষর ভেঙে দেওয়া, এমনকী বিদ্যাসাগর প্রবর্তিত বাংলার বর্ণপরিচয়ের অক্ষরের চেহারায়ও বদল আনা হয়েছে। প্রায় আড়াই হাজার বছর আগে হিমালয় নরেশ শুদ্ধোধন পুত্র রাজকুমার সিদ্ধার্থ শিক্ষাগুরু আলার কালাম ও উদ্দক রামপুত্রর কাছে বিদ্যাভ্যাসের সময় অনুশীলন করেছিলেন বঙ্গ লিপির। ভগবান বুদ্ধদেবের প্রথম জীবনীকার অশ্ব ঘোষ তার বুদ্ধচরিতে এটি উল্লেখ করেছেন। শাস্ত্রকারেরা বলেন মহাকালীর গলায় যে মুণ্ডমালা রয়েছে সে তো বঙ্গলিপির এক একটি অক্ষর। সেই বঙ্গ লিপির সংস্কারের নামে তাঁর চেহারার বদল হচ্ছে। বাঙ্গালি নির্বিকার!

নেট দুনিয়ায় ইংরেজি থেকে বাংলা শব্দের ও বাক্যের রূপান্তর যা হচ্ছে তা তো রীতিমতো আতঙ্কের। ইংরেজি মিস্টার শব্দের প্রতিশব্দ আসে জনাব, কখনই 'শ্রী' নয়, 'হ্যালো' বা 'হাই' শব্দ বললে কখনই নমস্কার নয়। হবে, সালাম। তাই রামধনু এখন রংধনু। রবীন্দ্রনাথের কবিতায় গানে মন্দির, শ্মশান ইত্যাদি শব্দ বাদ দিয়ে কৌশলে করা হয়েছে মাজার, কবর ইত্যাদি।

নিশ্চয়ই অনুমান করতে পারা যাচ্ছে এই অনুপ্রেরণার উৎস কোথায়? বাঙ্গালিকে যদি আজ নিজের স্বাভিমানে বেঁচে থাকতে হয়, তবে ফিরে তাকাতে হবে অতীত গৌরবে। শুরু করতে হবে বীরত্বের ইতিহাস। বাঙ্গালিয়ানার প্রবর্তন মহারাজাধিরাজ শশাঙ্ক। বাংলা নববর্ষ শুরু হোক শশাঙ্ক চর্চা দিয়েই। উদ্‌যাপন হোক মহারাজা শশাঙ্কের প্রতিশ্রুতি এবং তাঁর জয়ঘোষ দিয়ে। জয় বঙ্গ জয় শশাঙ্ক। ☐

বিজ্ঞপ্তি

স্বস্তিকার যে সকল বার্ষিক গ্রাহকের মেয়াদ শেষ হয়েছে বা শেষ হতে চলেছে তাঁদের কাছে বিনীত নিবেদন, আপনারা পরবর্তী বছরের জন্য গ্রাহকমূল্য ৭০০ টাকা অবিলম্বে জমা দিয়ে গ্রাহকপদ নবীকরণের মাধ্যমে আমাদের সহযোগিতা করুন। স্বস্তিকার প্রতিনিধির মাধ্যমেও টাকা পাঠাতে পারেন।

নতুন গ্রাহক হলে সম্পূর্ণ নাম- ঠিকানা, ফোন নম্বর (পিন কোড সহ) অবশ্যই পাঠাবেন।

ব্যবস্থাপক, স্বস্তিকা

বাঙ্গালি বুদ্ধিমান, বাঙ্গালি যুক্তিবাদী, সেইসঙ্গে বাঙ্গালির মনন বিশ্বজুড়ে। তাই যে মতটা যুক্তিগ্রাহ্য এবং বিজ্ঞানভিত্তিক সেটিকেই মানবে আধুনিক বাঙ্গালি। কিন্তু আরগুমেনটেটিভ তর্কবাগীশ বাঙ্গালিও অনেক সময় গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে যুক্তিবোধের থেকে আর্ষপ্রয়োগকেই বেশি মেনে নেয়। সমস্যাটা সেখানেই।

বঙ্গাব্দ প্রবর্তনের কৃতিত্ব মহারাজা শশাঙ্কেরই

ড. জিষ্ণু বসু

বাংলা বর্ষপঞ্জি বা বঙ্গাব্দের শুরু কোথায়? এবারের পয়লা বৈশাখে ১৪৩১ বঙ্গাব্দের শুরু হবে। এবছর দুই বঙ্গেই পয়লা বৈশাখ একই দিনে, ১৪ এপ্রিল। মজার ব্যাপার হলো, দু'বছর আগে পশ্চিমবঙ্গে পয়লা বৈশাখ ছিল ১৫ এপ্রিল। কিন্তু ঢাকাতে মানে বাংলাদেশের জাতীয় বর্ষপঞ্জি অনুসারে পয়লা বৈশাখ ছিল ১৪ এপ্রিল তারিখে। আমাদের বাংলা ক্যালেন্ডারের সঙ্গে মাসের দিনসংখ্যাও অনেকটাই আলাদা ওদেশে। কেন এই পার্থক্য? দেশভাগের আগে তো একটাই বঙ্গ ছিল। তখন বঙ্গভূমিতে কোন বর্ষপঞ্জি অনুসৃত হতো? ঢাকার দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ আর কলকাতার স্যার সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কি আলাদা পয়লা বৈশাখ মানতেন? সাহিত্যসম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র, বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ বা বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল কোন বর্ষপঞ্জী মেনে নববর্ষ পালন করতেন?

প্রাচীনকাল থেকে পশ্চিমবঙ্গের মাটিতে চলে আসা এই যে চান্দ্র-সৌর বর্ষপঞ্জি তার শুরুটাই-বা কোথায়? স্বাভাবিকভাবেই মনে হবে আজ থেকে ১৪৩১ বছর আগেই বঙ্গাব্দের যাত্রা শুরু হয়েছিল। কিন্তু সেখানেও বিতর্ক আছে। অনেকেই এখন বলছেন, ১৫৫৬ খ্রিস্টাব্দকে শুরু ধরে বাদশা আকবর কর্তৃক এই বঙ্গাব্দ চালু হয়েছিল। বাংলা মাসের দিন পালটানো বা সূচনাকাল নিয়ে বিতর্ক বড়ো করে উঠে এল গত শতাব্দীর ষাটের দশকে। ১৯৬৪ সালে বাংলাদেশ জুড়ে হিন্দুদের ওপর আক্রমণ হলো। সেদেশ থেকে হিন্দুদের বিতাড়ন মানে 'এথনিক ক্লিনসিং' শুরু হলো পাকিস্তান সরকারের তত্ত্বাবধানে। কিন্তু মানুষ তাড়ালেই তো শুধু হবে না, পূর্ব পাকিস্তান তো একটা গোটা স্বতন্ত্র সংস্কৃতি। হিন্দুর পরম্পরাকে বাদ দিলে তো তার অর্ধেকের বেশিটাই খালি হয়ে যাবে। এই সংস্কৃতির কেন্দ্রবিন্দুতে দাঁড়িয়ে আছে বাংলা বর্ষপঞ্জি যার ভিত্তিটা সূর্যসিদ্ধান্তের উপরে স্থাপিত।

বাংলা বর্ষপঞ্জি পরিবর্তনের জন্য পাকিস্তানের তদানীন্তন সরকার একটি কমিটি তৈরি করেছিল। যার প্রধান ছিলেন মহম্মদ শহীদুল্লাহ। ১৯৬৬ সালে শহীদুল্লাহ সাহেবের কমিটি তাদের রিপোর্ট জমা দেয়। কমিটির সুপারিশ অনুসারে বাংলার প্রথম পাঁচটি মাস ৩১ দিন হবে ঠিক হলো, আর বাকি মাসগুলি ৩০ দিনের। লিপ-ইয়ার হলে ফাল্গুন মাস ৩১ দিন ধরে নেওয়া হবে। যেহেতু তিথি নক্ষত্রের হিসাব রাখতে হবে না তাই প্রতি বছরই ১৪ এপ্রিল তারিখে হবে পয়লা বৈশাখ। এই রিপোর্টেই ৪ নম্বর পয়েন্ট হিসেবে উল্লেখ ছিল যে বঙ্গাব্দের সূচনা করেছিলেন বাদশা আকবর খ্রিস্টীয় ১৫৮৪ সালে। তারও ২৯ বছর আগে মানে তাঁর মসনদে বসার সাল ১৫৫৬ খ্রিস্টাব্দ অর্থাৎ ৯৬৩ হিজরি সালকে বঙ্গাব্দের শুরু হিসেবে ঘোষণা করেন।

পাকিস্তান সরকারের এই রিপোর্ট নিয়ে বিতর্কের বিস্তর অবকাশ আছে। ১৪ এপ্রিলকেই পয়লা বৈশাখের দিন স্থির করা এককথায় অবৈজ্ঞানিক। সূর্যসিদ্ধান্ত মতে, বছরের দিনসংখ্যা ৩৬৫.২৫৮৭৫৬ আর গ্রেগরিয়ান ক্যালেন্ডার হিসেবে ৩৬৫.২৪২২ দিন। মানে পার্থক্য হলো ০.০১৬৫৫৬

দিন। শহীদুল্লাহ সাহেব যখন রিপোর্ট জমা দিয়েছিলেন সেদিন থেকে আজকের মধ্যেই প্রায় একদিনের (০.৮৯৪ দিনের) পার্থক্য হয়ে গিয়েছে।

বছরের প্রথম পাঁচ মাস ৩১ দিনের হওয়ার হিসেবটাও সমীচীন নয়। ভারতীয় বর্ষপঞ্জির অন্যতম বিশেষত্ব হলো নক্ষত্রের অবস্থান। মাসের নামও এর সঙ্গে সম্পর্কিত। বঙ্গাব্দের শুরুর বছর মানে ৫৯৪ খ্রিস্টাব্দে ভার্নাল ইক্যুইনক্স বা মহাবিষুবের দিন ছিল ২০ মার্চ। ঠিক তার পরেই ২৭ মার্চ ছিল অমাবস্যা। বঙ্গাব্দের প্রথম অমাবস্যার দিন রেবতী নক্ষত্র, সূর্য, চন্দ্র ও পৃথিবী ঠিক এক সরলরেখায় ছিল। রেবতীকে আদি নক্ষত্র ধরেই বঙ্গাব্দের মাসগুলিকে ইচ্ছেমতো ৩১ দিনের ধরে নিলে বঙ্গদেশের পণ্ডিত মানুষদের এতশো বছরের সাধনার ধনকে জলাঞ্জলি দেওয়া হবে।

শহীদুল্লাহ কমিটি বলেছিলেন, মুঘল বাদশা আকবর ১৫৮৪ সালে বঙ্গাব্দ শুরু করেন। আকবর তাঁর জোতির্বিদ ফতল্লাহ শিরাজিকে হিজরি সালের সঙ্গে সূর্য সিদ্ধান্তের বর্ষগণনার হিসাব মিলিয়ে বর্ষপঞ্জি রচনার কথা বলেন। তখন আকবরের রাজত্বের ২৯ বছর হয়ে গেছে। তাই তাঁর মসনদে বসার বছর অর্থাৎ ১৫৫৬ সাল বা ৯৬৩ হিজরিকে প্রথম বঙ্গাব্দ ধরতে বলেন। এরপর থেকে সৌরবর্ষ যোগ করলে বঙ্গাব্দ পাওয়া যায়। যেমন ২০২৪ খ্রিস্টাব্দ মানে ৯৬৩ + (২০২৪-১৫৫৬) = ১৪৩১ বঙ্গাব্দ।

এই মিলিয়ে দেওয়া নিয়েও অনেকে আপত্তি করেছেন। বিজ্ঞানী পলাশবরণ পাল তাঁর 'সাল তারিখের ইতিহাস' বইতে একটি সরল যুক্তি দিয়েছেন। আকবর সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন ১৫৮৪ সালে, তাহলে সিদ্ধান্ত তখন থেকে কার্যকরী করাই ছিল স্বাভাবিক। কিন্তু ১৫৮৪ খ্রিস্টাব্দ মানে ৯৯৩ হিজরি, সেক্ষেত্রে আর উপরের ম্যাজিক সমীকরণ মিলবে না।

আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো, আজকের যুগে আকবরের রাজত্বের ২৯ বছর বাদ দেওয়া সহজ, কিন্তু আকবরের দরবারও চলত হিজরি সাল হিসেবে। হিজরি সাল হিসেবে ১২টি ২৯.৫ দিনের চান্দ্রমাসের যোগফল মানে ৩৫৪ দিনে বছর। তাই দুটি সময়ের ব্যবধান হিজরি সাল গণনা হিসেবে ৩০ বছরের কিছু বেশি। ফতল্লাহ শিরাজি বাদ দিলে ৩০ বিয়োগ করতেন, ২৯ কখনওই নয়। তাই বাদ দিয়ে অঙ্ক মেলানোর প্রচেষ্টা নিঃসন্দেহে আধুনিক। তাছাড়া আকবরের জীবদ্দশায় মোগলরা বাঙ্গলায় রাজনৈতিক শক্তি হিসেবে উঠে আসেনি। ১৫৭৬ সালে রাজমহলের যুদ্ধে মুঘলদের কাছে বাঙ্গলার আফগান শাসক দাউদ খান কররানী পরাজিত হন। কিন্তু তারপরেও লাগাতার যুদ্ধ চলে। জাহাঙ্গিরের শাসনকাল পর্যন্ত এই যুদ্ধ চলেছে। তাই ১৫৮৪ সালে সারা বঙ্গপ্রদেশে শান্তিতে রাজত্ব করার অবস্থা বাদশা আকবরের ছিল না। তখন মুঘল রাজত্ব কাবুল, মুলতান থেকে পূর্বে পাটনা পর্যন্ত মোট ১২টি সুবায় বিভক্ত ছিল। বাদশা আকবর বেছে বেছে আপাত অস্থির বাঙ্গলাতেই তাঁর অব্দ শুরু করলেন কেন? স্বাভাবিক যুক্তিবোধে এর সঠিক উত্তর মেলে না।

আবুল ফজলের আইন-ই-আকবরিতে বঙ্গাব্দ বা বাংলায় বিশেষ সন প্রবর্তনের কোনও উল্লেখ নেই। বিভিন্ন বিষয় আলোচনার সময়ে অনেক সালতামামি আছে কিন্তু বাংলা অব্দ নিয়ে একটি শব্দও নেই। হিজরি সাল হিসেবে ভারতবর্ষের ফসলের কর আদায়ের অসুবিধে হচ্ছে, তাই ফতল্লাহ শিরাজিকে তারিখ-ই-ইলাহি তৈরি করতে বলেছিলেন বাদশা। এরকম হতেই পারে যে বঙ্গে প্রচলিত বর্ষপঞ্জিকে দেখে এমনই একটা চান্দ্র-সৌর অব্দ তৈরি হয়েছিল। কিন্তু শস্যশ্যামলা বঙ্গদেশে এটি ফসলের কালের সঙ্গে মিলত, কাবুলে বা মুলতানে নিশ্চয়ই মিলত না। তাই আকবরের ইন্তেকালের সঙ্গে সঙ্গেই দীন-ই-ইলাহির মতো তারিখ-ই-ইলাহিও হারিয়ে যায়।

কবি দ্বিজেন্দ্রলাল রায় 'বঙ্গ আমার জননী আমার' কবিতায় যশোরের রাজা প্রতাপাদিত্যের কথা বলেছেন— 'যুদ্ধ করিল প্রতাপাদিত্য তুই কি না সেই ধন্য দেশ'। এই প্রতাপাদিত্য মোগলদের সঙ্গেই যুদ্ধ করেছিলেন। ১৫৮৪ সালে তিনিও রাজ্যপাট হাতে পান। তিনি যশোরে শিক্ষাবিস্তারের জন্য জেসুইট মিশনারিদের গির্জা বানাতে দিয়েছিলেন। তাঁর নৌবহরে পর্তুগিজ কুশল নাবিকরা ছিলেন। অর্থাৎ এক স্পন্দনশীল বঙ্গ সেদিন দক্ষিণ-পূর্ব দিকে ছিল। তাই আকবরের রাজমহল জয় করেই বঙ্গাব্দ প্রচলনের প্রশ্নই ওঠে না।

ভারত স্বাধীন হওয়ার পরে 'ক্যালেন্ডার রিফর্ম কমিটি' গঠিত হয়েছিল। অধ্যাপক মেঘনাদ সাহা এই কমিটির সভাপতি হয়েছিলেন। এই কমিটির সুপারিশ অনুসারেই 'শালিবাহন শক' বর্ষপঞ্জিকে ভারতবর্ষের জাতীয় বর্ষপঞ্জি হিসেবে গ্রহণ করা হয়। ১৯৫৫ সালে এই কমিটির পূর্ণাঙ্গ রিপোর্ট প্রকাশিত হয়। এই কমিটি দেখেছিল যে ভারতীয় কালগণনা পদ্ধতি ছিল অত্যন্ত বিজ্ঞানসম্মত। আলেকজান্ডারের ভারত আক্রমণের পরে গ্রিকদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ মেলামেশা হলেও গ্রিক জ্যোতির্বিদ্যা থেকে ভারতের কিছু নেওয়ার ছিল না।

বাংলা সাল গণনার বিষয়েও এখানে আলোকপাত করা হয়েছে। চতুর্থ থেকে ষষ্ঠ শতকের শুরুর সময় পর্যন্ত বঙ্গপ্রদেশ মূলত গুপ্ত সাম্রাজ্যের অংশ ছিল। তারপর ৭৫০ থেকে ১১৫০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত পাল রাজারা শাসন করেন। সেন রাজারা কর্ণাটকের ক্ষত্রিয় ছিলেন। তাঁরাই বঙ্গপ্রদেশে শকাব্দ সাল গণনা রীতি নিয়ে আসেন। মুসলমান শাসনের সময় নবাব দরবারে হিজরি সাল চলত। কিন্তু শিক্ষিত সমাজে 'শক' বর্ষপঞ্জিই ব্যবহৃত হতো। এরাজ্যে সাধারণ মানুষ 'পরগণাতি অব্দ' নামে একটি বর্ষপঞ্জি মানতেন। তারিখ-ই-ইলাহির পরে থেকে নবাব দরবারেও সূর্যসিদ্ধান্তই মানা হতো।

গুপ্তযুগের পরে এবং পালযুগের আগে ছোটো সামন্ত রাজারা রাজত্ব করেছেন। হর্ষচরিতে মৌখরি বংশের প্রতিনিধি শশাঙ্কের বর্ণনা আছে। কামরূপ-বিজয়ী এই শশাঙ্কের রাজধানী ছিল অধুনা মুর্শিবাদাদের কাছে কর্ণসুবর্ণতে। আজ থেকে ১৪৩০ বছর আগে শশাঙ্কই গৌড়ের রাজা ছিলেন। তাই বাংলা বর্ষপঞ্জির প্রবর্তক হিসেবে শশাঙ্কের সপক্ষেই যুক্তির পাল্লাই ভারী। তবে নিশ্চয় তখন একে বঙ্গাব্দ বলা হতো না। কিন্তু বাংলা সাল গণনা তখন থেকেই শুরু।

নীতীশকুমার সেনগুপ্ত ১৯৫৭ সালের বেঙ্গল ক্যাডারের আইএএস। দুই বঙ্গের প্রতি টান থেকে একটি গবেষণামূলক গ্রন্থ লিখেছেন তিনি— 'ল্যান্ড অব টু রিভার্স : এ হিস্ট্রি অব বেঙ্গল ফ্রম দ্য মহাভারত টু মুজিব।' লেখক দেখিয়েছেন বাঁকুড়ার ডিহারগ্রাম ও সোনাতপনে হাজার বছরের প্রাচীন শিব মন্দিরে বাংলা অব্দের উল্লেখ আছে।

মেঘনা গুহঠাকুরতা ও উইলিয়ম ভ্যান শেন্ডোলের বই 'দ্য বাংলাদেশ রিডার : হিস্ট্রি, কালচার, পলিটিক্স' প্রকাশিত হয়েছে ২০১৩ খ্রিস্টাব্দে। বইটিতে বাঙ্গলার বর্ষপঞ্জি প্রবর্তনের কৃতিত্ব গৌড়েশ্বর শশাঙ্ককেই দেওয়া হয়েছে।

বঙ্গাব্দ নিয়ে বিস্তর গবেষণার সুযোগ আছে। বাঙ্গালি বুদ্ধিমান, বাঙ্গালি যুক্তিবাদী, সেইসঙ্গে বাঙ্গালির মনন বিশ্বজুড়ে। তাই যে মতটা যুক্তিগ্রাহ্য এবং বিজ্ঞানভিত্তিক সেটিকেই মানবে আধুনিক বাঙ্গালি। কিন্তু আরগুমেনটেটিভ তর্কবাগীশ বাঙ্গালিও অনেক সময় গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে যুক্তিবোধের থেকে আর্যপ্রয়োগকেই বেশি মেনে নেয়। সমস্যাটা সেখানেই। কারণ একালের লোভী ও সুচতুর, তথাকথিত বিদ্বজ্জন ও বুদ্ধিজীবী সমাজ অর্থ ও পদের মোহে এক গভীর বঙ্গসংস্কৃতি বিরোধী ষড়যন্ত্রে বহু দিন ধরেই লিপ্ত।

(লেখক কলকাতায় সাহা ইনস্টিটিউট অব নিউক্লিয়ার ফিজিক্স-এ কর্মরত বিজ্ঞানী)

বঙ্গের নবজাগরণে কয়েকজন অনন্যার কথা, যাঁরা পথ দেখালেন

ড. রাজলক্ষ্মী বসু

শুরুতে রাখলাম 'গোরা' উপন্যাসের রেফারেন্স। সম্ভবত বাংলা সাহিত্যের এবং রবীন্দ্রনাথেরও সেরা সৃষ্টি। লক্ষ্য করার মতো চরিত্র আনন্দময়ী, বরদাসুন্দরী, সুচরিতা,

স্বর্ণকুমারী দেবী

ললিতা। কেউ ঘরে তো কেউ বাইরে প্রতিবাদী। তাঁরা স্বমহিমায় উদ্ভাসিত। তাঁরা আধুনিক মনের। যুক্তিবাদী। নারী পুরুষের ভেদ ঘোচানোর ফাইনাল হুইসেল বাজায় 'গোরা'। সমাজের হাজার মেকি রক্ষণশীলতার বেড়া টপকে তাঁরা পুরুষের সমকক্ষ। বা তারা নিজের নিজের পৃথিবীর মালিক। বন্ধননিবৃত্তির প্রতীক সৃষ্টি 'গোরা' তখনই রবি ঠাকুর প্রকাশের সাহস পেলেন যখন ১৯ শতকের শেষ। যখন এই বাঙ্গালির ঘরে অন্ধকার কিন্তু আলোর পথ দেখাতে জ্যোতির্ময়ী মহীয়সী নারীরা, বীরাঙ্গনারা, প্রতিবাদিনীরা, ব্যতিক্রমীরা বঙ্গ ললনার পটে আঁকা ছবির থেকে বেরিয়ে আসছেন। পথ প্রদর্শন করছেন সমাজকে। নিন্দিত হচ্ছেন, সমালোচিত হচ্ছেন কিন্তু তাঁরা সবাই যেন এক একজন 'গোরা'র ললিতা; গৃহের মধ্যেও আনন্দময়ীর মতো নিত্য জীবনবোধের ও জাতীয়তাবোধের পূজারি।

বাঙ্গালির ঘরে সেই সব অন্য ধাঁচের দেবীরা তখন তাঁদের স্বমহিমা প্রতিষ্ঠিত করছেন। তাঁদের নামের সংখ্যা নেহাতই করমধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। অসংখ্য নাম ব্যতিক্রমী বাঙ্গালি নারী চরিত্র যাঁরা দেশকে আলোর দিশা দেখালেন, তাঁদের কীর্তি, ভাবনা, পদক্ষেপে— তাঁদের সবার নাম হয়তো এই নিবন্ধে বিস্তারিত বিবরণের অবকাশ রাখছে না। সীমিত নিবন্ধ অপারগ অসীম ক্ষমতার এমন অনেক নাম এবং তাঁদের জীবন সংগ্রামকে উন্মীলিত করতে। বাঙ্গালির রেনেসাঁ হতো না যদি এঁরা না থাকতেন। অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর

সুনয়নী দেবী

যখন বাস্তববাদ ও পাশ্চাত্য মতাদর্শের প্রভাবে ভারতীয় শিল্পকে প্রভাবিত করছেন তখন তাকে বাস্তবায়িত করতে বঙ্গললনা চিত্রশিল্পী সুনয়না দেবীই ছিলেন সর্বক্ষণের শক্তি। ইতিহাস তেমন একটা মনে রাখেনি সুকুমারী দেবী, তৈলচিত্র শিল্পী প্রতিমা দেবীকেও। অষ্টাদশ শতকে ছবি এঁকে তাঁরাই পরবর্তী নারীমুক্তি ও জাতীয়তাবাদী কার্যক্রমে বঙ্গ তনয়াদের সক্রিয় উপস্থিতির পথের চিত্রটি যেন ভবিষ্যতের জন্য তৈরি করেন।

রবি ঠাকুরের কথা দিয়ে শুরু করতেই হলো, কারণ ঠাকুরবাড়ি মেয়েদের অন্তঃপুর থেকে বাইরে এনেছে। যা তাঁরা বাস্তবে প্রয়োগ করেছেন তাই দিয়েই যেন সাহিত্যের অসামান্যাদের সৃষ্টির রসদ পেয়েছেন। ভারতে যখন রাজনৈতিক পরিসরে স্ত্রীদের উপস্থিতির হার এবং তার বৃদ্ধির বিষয়ে বিশেষ চর্চা হয় তখন ফিরে তাকাতেই হয় প্রতিস্পর্ধায় ভরা সরলা দেবী চৌধুরানীর দিকে (১৮৭২-১৯৪৫)। তিনি পুরুষের সমকক্ষে এসে লিঙ্গ বৈষম্য ঘুচিয়ে যখন কলকাতা জাতীয় কংগ্রেসের অধিবেশনে প্রখর ইতিহাস ও রাজনৈতিক চেতনা নিয়ে উপস্থিত হলেন। মৌলিক অধিকার বিষয়ে সোচ্চার। যিনি রবীন্দ্রনাথের ন' দিদি স্বর্ণকুমারী দেবীর কন্যা। সম্ভবত মোস্ট চ্যালেঞ্জিং এবং সেকেন্ড ওয়েভ ফেমিনিজমের সিম্বল সরলা দেবী। যে 'জীবনের ঝরাপাতা'-তে নারী ও পুরুষের অবস্থান সম্বন্ধে এক চূড়ান্ত অপ্রিয় সত্যি বললেন, 'কিন্তু মেয়েরা যদি পুরুষ দেবতাকেই বলে বসেন, তোমার সিংহাসনটাই আমায়

প্রতিমা দেবী

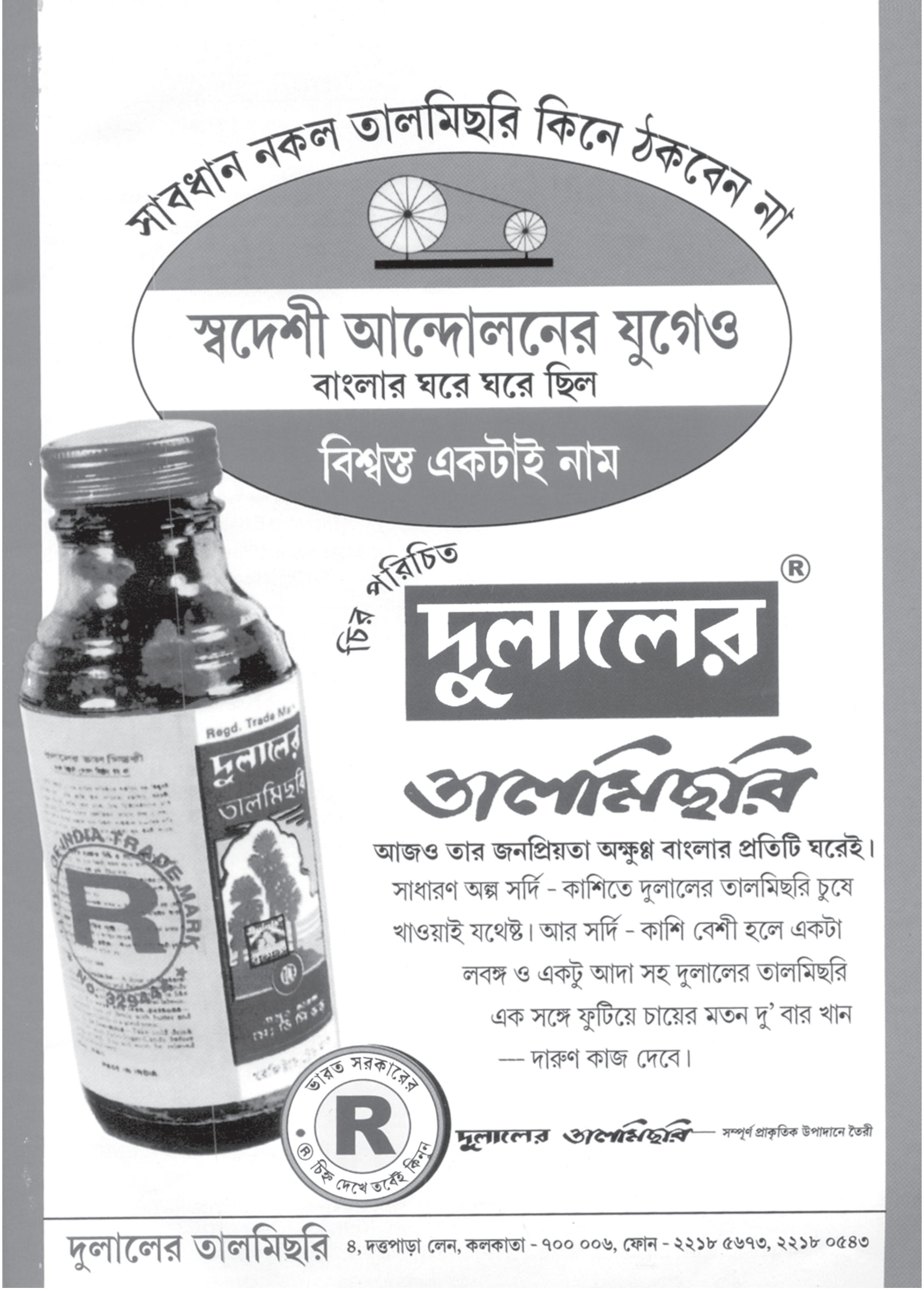
সাবধান নকল তালমিছরি কিনে ঠকবেন না
স্বদেশী আন্দোলনের যুগেও
বাংলার ঘরে ঘরে ছিল
বিশ্বস্ত একটাই নাম
চির পরিচিত
দুলালের®
তালমিছরি
আজও তার জনপ্রিয়তা অক্ষুণ্ণ বাংলার প্রতিটি ঘরেই।
সাধারণ অল্প সর্দি - কাশিতে দুলালের তালমিছরি চুষে খাওয়াই যথেষ্ট। আর সর্দি - কাশি বেশী হলে একটা লবঙ্গ ও একটু আদা সহ দুলালের তালমিছরি এক সঙ্গে ফুটিয়ে চায়ের মতন দু' বার খান
--- দারুণ কাজ দেবে।
Regd. Trade Mark
দুলালের
তালমিছরি
R
ভারত সরকারের
R
(R) চিহ্ন দেখে তবেই কিনুন
দুলালের তালমিছরি — সম্পূর্ণ প্রাকৃতিক উপাদানে তৈরী
দুলালের তালমিছরি ৪, দত্তপাড়া লেন, কলকাতা - ৭০০ ০০৬, ফোন - ২২১৮ ৫৬৭৩, ২২১৮ ০৫৪৩

ছেড়ে দাও না ভাই— তা হলেই বিপদ, তা হলেই পুরুষের পৌরুষ বেরিয়ে পড়ে, চোখ রাঙা করে বলে, কভি নেহী'। সরলা দেবী অনেকটা এগিয়ে থাকা সময়ের চরিত্র। তাই আত্মজীবনীর এই অংশ থেকেই অনুমেয় তাঁর

সরলা দেবী

পূর্বের যাঁরা দীপশিখা প্রজ্বলিত করেছেন তাঁদের কতটা লড়াই করতে হয়েছে। সরলা দেবীর কথাই আবার বলি। যিনি সাহিত্য সেবা থেকে দর্শন-চর্চা, দৃঢ় চেতনার প্রজ্ঞাবতী। তাঁর জাতীয়তাবোধ তীব্র। রবি মামার প্রেরণায় সাহিত্য পাঠের দীক্ষা তাঁকে প্রস্তুত করেছিল 'ভারতী' পত্রিকার দায়িত্ব নিতে।

বালিকাবেলা থেকেই 'বালক', 'সখা' পত্রিকার রচনা প্রকাশে জাতীয়তাবোধের হাতেখড়ি। কাঁচা বয়সের মেয়ে তখন সরলা। ১৮৭৩-এ যখন বিহারে প্রবল দুর্ভিক্ষ তখন চায়ে চিনি না দিয়ে সে টাকা জমা করলেন ত্রাণ কাজে। ইলবার্ট বিলের বিরুদ্ধে আন্দোলনে তিনি বেথুনের দিদি কামিনী সেনের দ্বারা অনুপ্রাণিত। অবলা দাসের কথায় আস্তিনে বেঁধেছিলেন কালো ফিতে। সেই ছোটো বয়সে এতটাই জাতীয়তাবোধ যে নতুন মামা জ্যোতিরিন্দ্রনাথকে বলে বসলেন, 'আর বিদেশি নয়, এবার স্বদেশি সার্কাস দেখব। সরলা অনুভব করেছেন বাঙ্গালিরা একটু ঘরকুনো, শান্ত। 'ভারতী' পত্রিকায় 'বিলিতি ঘুষি বনাম দিশী কিল' শিরোনামে প্রবন্ধ লিখে বাঙ্গালি যুবকদের আমন্ত্রণ করলেন, গোরা (শেতাঙ্গ) সৈনিকদের কাছে পথেঘাটে অপমান আর সহ্য নয়। গঠন হলো অন্তরঙ্গ দল। ছেলেবেলায় রবিমামার গান গাইতেন— 'একী অন্ধকার এ ভারতভূমি এ দীনতা পাপ এ দুঃখ ঘুচাও, ললাটের কলঙ্ক মুছাও/নহিলে এ দেশ থাকে না'।

তিনি বালিকা থেকে যখন নারী হলেন তখনও প্রত্যয় করলেন, 'not practicing physical education is a crime, against yourself and those who depend on you'— অস্ত্র ধরতে বলছেন সরলা। বাঙ্গালি যুবকদের সংগঠিত করে তৈরি করলেন 'সুহৃদ সমিতি'। নিজের পায়ে দাঁড়াক বাঙ্গালির ঘরের ছেলেরা। যারা নিজের জমিতে চাষ করতে চান সরলা তাঁদের নিজের অর্থে জমি ও সহায়ক বস্তু দিতেন। মহিলাতো ছেড়েই দিই, সরলার মতো নির্ভীক চরমপন্থী রাজনৈতিক

অবলা বসু

ব্যক্তিত্ব খুব কম পুরুষই ছিলেন। তিনিই দুর্গাষ্টমীর দিন সূচনা করলেন বীরাষ্টমীর অনুষ্ঠান। অস্ত্র চালানোর প্রদর্শন প্রতিযোগিতা। তারপর কলকাতার থেকে গ্রামে গ্রামে বিস্তার পেতে থাকল বলবীর্য প্রদর্শন। শিবাজী উৎসবের ধাঁচে শুরু করলেন 'প্রতাপাদিত্য উৎসব'। পিঠেপুলি উৎসব থেকে লাঠি খেলা, কী করেননি সরলা। স্বদেশী জিনিসের জন্য লক্ষ্মীর ভাণ্ডার তিনিই তৈরি করলেন। বাঙ্গালির মধ্যে যে বাড়তি ভদ্রলোকের ছা-পোষা স্বভাব তাতে জাতীয়তাবোধের শান দিয়ে আত্মাভিমানের পাঠ হাতে-কলমে করালেন একজন নারী সরলা দেবী। স্বয়ং বিবেকানন্দ বললেন, সরলার শিক্ষা প্রকৃত শিক্ষা। গান্ধীজীর অতি অহিংস নীতি তাঁকে বিষণ্ণ করে ছিল।

তিনি এতটাই সাহসী ছিলেন যে ১৯২৫-এর এক ভাষণে স্পষ্ট বলেন, অসহযোগ আন্দোলনে দেশের যুবকের যথাযথ প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়নি। জাতীয় কংগ্রেসের সমালোচনা করে ১৯৩১-এ বলেন এই কংগ্রেস মেয়েদের আইন ভাঙার সময় কাজে লাগায়। প্রণয়নের সময় নয়। অসামান্য তেজ, বুদ্ধি ও আবেগ না থাকলে এই ভাষণ হয় না। ১৯১০-এ তিনিই স্থাপন করলেন 'ভারতী স্ত্রী মহামণ্ডল' যা প্রথম সর্বভারতীয় মহিলা সংগঠন। কুমারী থেকে বিধবা, অনাথা সবাই শিক্ষা পেল। সরলা দেবী এক নিয়ম ভাঙার ইতিহাস, এক ভিন্ন সত্তা। যিনি বলে যেতে পারলেন— 'কিন্তু শাস্ত্রের ব্যবহারগুলি সব পুরুষের একার গড়া, মেয়েদের ভোট বা সম্মতি লইয়া গঠিত হয় নাই।' আজকেও সত্যি এবং পরতে পরতে প্রাসঙ্গিক সরলা দেবী। তবে এও ঠিক মা স্বর্ণকুমারী দেবী না থাকলে সরলা হওয়া এত সহজ স্বতঃস্ফূর্ত হতো না। যে মা সে যুগে থেকেও চেয়েছিলেন মেয়ে দেশের কাজ করুক। বিবাহ-নির্ভর জীবনের প্রতি বিন্দুমাত্র আকৃষ্ট ছিলেন না সরলার মা স্বর্ণকুমারী দেবী। তিনি কি কম বিপ্লবী, কম সাহসী, কম তেজস্বিনী! মা যে এমন ব্যতিক্রমী, যিনি ১৮৭৩-এ সম্ভবত বাঙ্গলায় প্রথম অপেরা রচিত বসন্ত উৎসব প্রকাশ করেন। গৃহ শিক্ষিতা হয়েও তিনি ২৫টি বই

ভগিনী নিবেদিতা

লেখেন। 'ভারতী' তো আসলে তাঁরই সম্পাদনায় প্রকাশিত হতো। পরে সে দায়িত্ব সরলা নিলেন। এবং ১৮৮৯ ও ১৮৯০-এর

ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের বার্ষিক অধিবেশনে পণ্ডিতা রমাবাঈ এবং কাদম্বিনী গাঙ্গুলীর সঙ্গে তিনি যোগদান করেন।

১৮৮২-১৮৮৬ সাল পর্যন্ত তিনি লেডিস থিয়োসফিক্যাল সোসাইটির পাশাপাশি বিধবা শিল্প আশ্রমের সভাপতি হন। অর্থাৎ এর থেকেই স্পষ্ট যে, সরলা দেবী মা স্বর্ণকুমারী দেবীর যোগ্য উত্তরসূরী এবং মেয়েলি সংবেদনশীলতাকে সংরক্ষণ করেও যে পুরুষের সমকক্ষে কাজ করা যায় তা তাঁরা প্রমাণ করলেন। রামমোহন রায়, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর লড়াই করে মহিলা সুরক্ষার আইন আনেন। সে এক তীব্র সংগ্রাম, সমর্থনহীন সংঘর্ষ। কিন্তু এই যে বাঙ্গালি মেয়েরা, মায়েরা, তাঁরা সেই নিদারুণ সংকটের সময়েও লিখে, গান গেয়ে, সভা করে, সংগঠন নির্মাণ করে, সক্রিয় কার্যকলাপের মাধ্যমে প্রমাণ করলেন, প্রতিষ্ঠিত করলেন মেয়ে মানেই সে অন্তঃপুরবাসী নয়। ১৮৯৬-তে স্বর্ণকুমারী যখন 'সখী' সমিতি স্থাপন করলেন তার পরেই লিখেছেন 'আরেকটি প্রস্তাব' প্রবন্ধ। যেখানে কী চমৎকার ভাবে বলেছেন— 'বিধবারা যদি রীতিমতো শিক্ষালাভ করে অন্তঃপুরে স্ত্রীলোক ও বালকদিগের শিক্ষাদান করে এবং অন্যান্য দেশহিতকর কর্মে নিযুক্ত থাকে, তাহলে তারা নিজেদের অন্ন জোগাড় করে নিতে পারবে, লাঞ্ছনা গঞ্জনার থেকে মুক্তি পাবে।'

অর্থাৎ পুনর্বিবাহের চাইতেও নিজের বলে বলীয়ান হওয়ার দিকে তিনি বেশি মনযোগ দেন। যুগনায়িকা ছাড়া আর কি কিছুই বলা যায় এঁদের? ঠিক একইভাবে মেয়েদের শক্তিশালী করতে বদ্ধপরিকর ছিলেন অবলা বসু। যদিও স্টিরিয়োটাইপিং তাঁর ক্ষেত্রে খানিক প্রযোজ্য তো বটেই। বিজ্ঞানী জগদীশচন্দ্র বসুর সহধর্মিণী গুণী অবলা বসু। এতক্ষণ পর্যন্ত কারোর পরিচয়ে স্বামী বা পিতার নাম উল্লেখ করতে হয়নি। অবলা বসু যেন বিজ্ঞান-সেবিকাই রইলেন। স্বেচ্ছায় লাইমলাইট থেকে বা বলা ভালো খ্যাতি, নামের থেকে একটু দূরত্বে চললেন। তাতে তাঁর অবদান তো কমে যায় না। নিজে ডাক্তারি পঠনপাঠন সম্পূর্ণ করতে পারেননি পরিস্থিতির প্রতিকূলতায়। দেশকে শক্তিশালী করতে হলে মেয়েদের বলবান করতে হবে। অবলা বসু তাই ১৯১৯-এ তৈরি করলেন নারী শিক্ষা সমিতি। শিক্ষক কারা হবেন? স্থির করলেন বিধবারা হবেন শিক্ষাদাত্রী। শিক্ষিত বিধবাদের শিক্ষয়িত্রী হিসেবে প্রশিক্ষণ দেওয়ার জন্য ১৯২৫-এ স্থাপন করলেন 'বিদ্যাসাগর বাণী ভবন'। শিক্ষার মাধ্যমে মেয়েদের আত্মবিশ্বাস, আত্মচেতনা ও রাষ্ট্রবোধ জন্ম নিক। বিধবা মানে কেবল উপেক্ষা আর অবহেলার পাত্রী নয়। তারাও ভারতমায়ের সম্পদ হোক, মাথা উঁচু করে মেধা, বুদ্ধি, পারদর্শিতায় সমাজের অপ্রতিরোধ্য অংশ হোক। এই চেতনা এক অতি উন্নত ও অগ্রগামী মননের প্রতিবিম্ব।

আর একটা বিশেষ নাম— যা সর্বকালের জন্য সেরা, যা প্রয়োগে ব্যবহারিক নারী জাতীয়তাবোধের শ্রেষ্ঠ সিম্বল, শুধু ভারতের নয়, নিরপেক্ষ বিচার করলে বিশ্বের সেরা ত্যাগী জাতীয়তাবাদী নারী চরিত্র— স্বামী বিবেকানন্দের মানসকন্যা ভগিনী নিবেদিতা। ভারতের যখন তীব্র অস্থিরতা ও সংকট তখনই যেন দেবীরূপে ভারতের অধ্যাত্মবোধে আকৃষ্ট হয়ে মার্গারেট এলেন নিবেদিতা হতে। সেই ১৬নং বোসপাড়া লেনের ছোট্ট একটা বাড়ি যেখান থেকে তাঁর স্বদেশচেতনা, রাষ্ট্র চেতনার দীপ্তি ভূভারতে ঠিকরে পড়েছে। যে বাড়িতে পদধূলি দিয়েছেন মা সারদা। নিবেদিতাকে আশীর্বাদ করতে, চরৈবেতি মন্ত্র দিতে। ভারত ও হিন্দুত্ব সমার্থক, জাতীয়তাবোধ ও হিন্দুত্ব এক মুদ্রার দুই দিক। অনুভব করলেন নিবেদিতা। লিখলেন হলো 'কালী দ্য মাদার', 'ওয়েব অব ইন্ডিয়ান লাইফ', 'ক্রেডল টেলস অব হিন্দুইজম'। তখন রবীন্দ্রনাথ থেকে জগদীশচন্দ্র বসু সবাই নিবেদিতার জ্ঞান, প্রজ্ঞাবোধ, বক্তব্যে বিস্মিত মুগ্ধ।

নিবেদিতা যেন প্রকৃতই 'লোকমাতা' যাঁর সান্নিধ্যে শিল্পী অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর অনুপ্রাণিত হন। নন্দলাল বসুকে নিজের খরচে নিবেদিতাই অজন্তায় পাঠান। ভারতের শিল্প সংস্কৃতির পুনরুজ্জীবনে 'প্রবাসী' ও 'মডার্ন রিভিউ'-এর সম্পাদক রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ও নিবেদিতার সঙ্গে শামিল হলেন 'ইন্ডিয়ান আর্টে'-এর মনোজ্ঞ রচনায়। নিবন্ধের শুরুতে ছিল আর্ট-এর উল্লেখ। নিবেদিতাও ভারতীয় আর্ট-এ প্রাণ সঞ্চার করলেন। শিল্প সঞ্চার করা, জাগ্রত করা একটি জাতির ভিত্তিকে বলীয়ান করে। নিবেদিতা তা উপলব্ধি করেন বলেই সামাজিক সংস্কারের পাশাপাশি স্বদেশ চেতনার সঙ্গে শৈল্পিক সংস্কারকেও সমান গুরুত্ব দেন। তৎকালীন স্টেটসম্যানের সম্পাদক র‍্যাডক্লিফ নিবেদিতার গুণে এতটাই মুগ্ধ ছিলেন যে বহু জাতীয়তাবাদী আন্দোলন মুখর নিবন্ধ নামে-বেনামে প্রকাশ করেন। স্বামীজীর দেহাবসানের পর আরও বেশি করে নিবেদিতা উপলব্ধি করেন পরাধীনতার শৃঙ্খল থেকে দেশকে মুক্ত করতেই হবে। তিনি যেন আগুনের লেলিহান শিখা। তাঁর স্লোগান ছিল 'এক জাতি এক প্রাণ একতা'। ঋষি অরবিন্দ নিবেদিতাকে 'শিখাময়ী' সম্বোধন করেন। চরমপন্থী সতীশ চন্দ্রের 'ডন সোসাইটি' ও 'অনুশীলন সমিতি' আসলে নিবেদিতারই একান্ত আপন বিচরণ কক্ষ।

নিরলস সাধনা করেছেন বিপ্লববাদ প্রচারের। ভারতীয় অধ্যাত্মবোধ জাগরণে। শিক্ষা, বিজ্ঞান থেকে শিল্প সবেতেই বিপ্লব, পরিবর্তন এনেছেন নিবেদিতা। নিবেদিতার জীবনকলা এই নিবন্ধে কোনো ভাবেই ধরা সম্ভব নয়। তিনি শ্রীমা সম্বন্ধে বলছেন— 'তিনি অনাড়ম্বর সহজতম সাজে পরম শক্তিময়ী মহত্তমা নারী।' তিনি উত্তরণ করেছেন সমাজকে ভেদাভেদের বিরুদ্ধে, সেবার পক্ষে। বহুজন হিতায় বহুজন সুখায় যাঁর প্রতিটি মর্মে। তিনি শিক্ষাবিদ, বাগ্মী, শিল্পতাত্ত্বিক, বিজ্ঞান সহায়ক, প্রত্নতাত্ত্বিক, ঐতিহাসিক, সমাজবিজ্ঞানী, সেবিকা, জাতীয়তাবাদী, নিঃশঙ্ক চিত্তের সংস্কার বিরোধী তেজস্বিনী। ভারত যাঁর কাছে শুধু রাষ্ট্র নয়, এক বাণী।

এ নিবন্ধ উন্নতশির সেই মহীয়সীদের, যাঁরা তাঁদের ব্যতিক্রমী কাজ, ভাবনা, ব্যক্তিত্বের জোরে উদাহরণ সৃষ্টি করেছেন। আশার আলো দেখিয়েছেন। যাঁরা স্ত্রী শিক্ষার কথা বলেই ক্ষান্ত হননি, স্ত্রী-শক্তি উন্মোচনের দিক দর্শন করেছেন। ঘরে বসে ছড়া লিখেছেন কুসুম কুমারী দাশ— 'আমাদের দেশে হবে সেই ছেলে কবে, কথায় না বড়ো হয়ে কাজে বড়ো হবে? মুখে হাসি বুকে বল তেজে ভরা মন 'মানুষ হইতে হবে'— এই মেয়েরা মানুষ হয়ে দেখিয়েছেন। মানুষ হওয়ার পথ প্রদর্শক হয়েছেন। এঁদের দেখানো পথে ছেলে-বুড়ো সবাই মানুষ হতে পারে। কারণ মনুষ্যত্ব ও রাষ্ট্রচেতনা এঁদের ব্রত। □

সিরাজ-উদ্-দৌল্লার পতনে বাঙ্গালি হিন্দু সেদিন রক্ষা পেয়েছিল

প্রণব দত্ত মজুমদার

ভারতের লোকসভা নির্বাচন এসে গেছে। একদলের প্রার্থী অন্যদলের প্রার্থীর ভাবমূর্তি মলিন করার জন্য আরোপ— প্রত্যারোপ, খিস্তিখেউড় আরম্ভ করে দিয়েছে। দেশের রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক প্রভৃতি ইস্যু নিয়ে একে অপরের সমালোচনা করবে এটা গণতন্ত্রে স্বাভাবিক ব্যাপার। কিন্তু এখন আমাদের দেশের রাজনীতি এতটাই নিম্নস্তরে নেমে গেছে যে একে অপরকে ব্যক্তিগত বা পারিবারিক ব্যাপার নিয়ে হামেশাই আক্রমণ করে চলেছে।

তেমনিই ঘটনা ঘটছে পশ্চিমবঙ্গের কৃষ্ণনগর লোকসভা কেন্দ্রের প্রার্থী রানিমা শ্রীমতী অমৃতা রায়কে নিয়ে। ঘটনাচক্রে তিনি মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের কুলবধূ। তিনি মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের নবমপুরুষের পরিবারভুক্ত। কৃষ্ণনগরবাসীরা তাঁকে ভালোবেসে 'রানিমা' বলে সম্বোধন করে থাকেন। তিনি সম্প্রতি বিজেপি-তে যোগদান করেছেন এবং বিজেপি তাঁকে কৃষ্ণনগর লোকসভা কেন্দ্রের প্রার্থী করেছে। একেই রাজঘরানার মানুষ, তাতে আবার প্রধানমন্ত্রী তাঁকে ফোন করে শুভেচ্ছা জানিয়ে দু'চার কথা বলেছেন। ব্যাস, সংবাদমাধ্যম এবং সোশ্যাল মিডিয়াতে তাই নিয়ে হইচই পড়ে গেছে। তিনি অতিরিক্ত আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দুতে চলে এসেছেন। তাঁর প্রতিপক্ষ তাঁর প্রতি এই অতিরিক্ত আকর্ষণ সহ্য করতে পারছে না। তাই তাঁকে ব্যক্তিগত আক্রমণ করা আরম্ভ করে দিয়েছে। আমাদের মুখ্যমন্ত্রী তো বলেই বসলেন তিনি হচ্ছেন বিশ্বাসঘাতক রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের পরিবারের সদস্য, কাজেই তিনি যেন বেশি মুখ না খেলেন। ইংরেজদের পক্ষ নেওয়ার জন্য মিরজাফরকে বিশ্বাসঘাতক বলা হলে মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রকে কেন বিশ্বাসঘাতক বলা হবে না ইত্যাদি। তিনি হুমকির সুরে বলেছেন তিনি ইচ্ছে করলে ইতিহাসের পর্দা ফাঁস করে দেবেন ইত্যাদি।

এ ব্যাপারে কিছু বলা প্রাসঙ্গিক বলে মনে হচ্ছে। অবশ্যই প্রেক্ষাপট ঐতিহাসিক। এ কথা আমরা সবাই জানি যে ১৭৫৭ সালে মুর্শিদাবাদের পলাশীতে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির রবার্ট ক্লাইভের সঙ্গে বাঙ্গলার নবাব সিরাজ-উদ্-দৌল্লার যুদ্ধ হয়েছিল। যুদ্ধে সিরাজ পরাজিত হয়ে পলায়ন করেন। পরে তাঁকে ধরে এনে হত্যা করে তাঁর নিজেরই এক কর্মচারী। তারপর ধীরে ধীরে বাঙ্গলার শাসনব্যবস্থা ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির হাতে চলে যায় এবং ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির প্রভাব সারা ভারতে ছড়িয়ে পড়ে। অবশেষে ১৮৫৭ সালের মহাবিদ্রোহের. পর সারা ভারতের শাসনব্যবস্থা ব্রিটিশ সরকারের হাতে চলে যায়। কাজেই ১৭৫৭ সালে পলাশীতে ইংরেজের কাছে সিরাজের হারকেই ভারতে ইংরেজ রাজত্বের সূচনা বলে ধরা হয়।

আমাদের দেশের তথাকথিত ঐতিহাসিকরা, যেহেতু নবাব সিরাজ-উদ্-দৌল্লা ইংরেজদের সঙ্গে যুদ্ধ করেছেন, তাই তাঁকে মহান করে দেখাবার চেষ্টা করছেন। আর আমাদের বাঙ্গালিরা তো সিরাজকে বাঙ্গলার হিরো, বাঙ্গালির আইকনের মর্যাদা দিয়েছে। সিরাজকে হিরো বানিয়ে কত নাটক সিনেমা হয়েছে। এমন করে বলা হয়েছে যেন সিরাজ ছিলেন বাঙ্গলার গর্ব, বাঙ্গালির গর্ব— সিরাজের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে বাঙ্গালির স্বাধীনতা, বাঙ্গলার স্বাধীনতা সূর্য অস্তমিত হয়েছে আর তার জন্য কত যে কাব্য রচিত হয়েছে তার ইয়ত্তা নেই।

এবার সিরাজের কথা একটু বলা যাক। সিরাজ ছিলেন বাঙ্গলার নবাব আলিবর্দি খানের মেয়ের ঘরের নাতি। আলিবর্দি

ফঃ ৩

খানের কোনো পুত্রসন্তান ছিল না। সিরাজের জন্ম হয়েছিল ১৭৩৩ সালে। তারা ছিল তুর্কি সুন্নি মুসলমান। আলিবর্দি খান মুঘল বাদশার কাছ থেকে দায়িত্ব পেয়ে বাঙ্গলায় এসেছিলেন ১৭২০ সালে। সিরাজের ঠাকুরদা ছিলেন আওরঙ্গজেবের সৎ ভাই, আর ঠাকুমা ছিলেন ইরানের খোরাসানের তুর্কি উপজাতির মেয়ে। সিরাজের জন্ম মুর্শিদাবাদে হলেও তাঁকে বাঙ্গালি বলা চলে না। তাঁদের চালচলন, আদবকায়দা, রীতি রেওয়াজ সবই ছিল বিদেশি মুসলমান নবাব সুলতানদের মতো। মুসলমানরা ধর্মীয় কারণে অন্য ধর্ম ও জাতির লোকদের ঘেন্নাই করতো এবং মুসলমানদের রাজত্বে অন্য ধর্মের লোকেদের জিম্মি হয়ে বসবাস করতে হতো।

১৭৫৬ সালে নবাব আলিবর্দি খানের মৃত্যু হলে ২৩ বছর বয়সে দাদুর আদরে 'বখে যাওয়া' সিরাজ বাঙ্গলার নবাব হয়ে গেলেন। সিরাজ স্বভাবে ছিলেন অত্যন্ত বদমেজাজি, খামখেয়ালি, অমানবিক, অত্যাচারী ও নিষ্ঠুর প্রকৃতির। দরবারে বিশিষ্ট ব্যক্তিদের তাঁর সঙ্গে মতের অমিল হলেই জঘন্য ভাবে অপমানিত করত। তাঁর দরবারে কেউই কোনো সম্মান পেতেন না। তাছাড়া সিরাজ ছিল দুশ্চরিত্র, লম্পট, নারীলোলুপ। সম্ভ্রান্ত ঘরের সুন্দরী নারীদের প্রতি তাঁর ছিল কুনজর। তাদের সতীত্বহানি করার জন্য সদা সচেষ্ট থাকতেন। সিরাজের চরিত্রের ব্যাপারে বিদ্যাসাগর 'বাঙ্গলার ইতিহাস' পুস্তকের প্রথম অধ্যায়ে যা লিখেছেন তা প্রণিধানযোগ্য। তিনি লিখেছেন--- 'সিরাজদ্দৌলা সিংহাসনে অধিরূঢ় হইয়া মাতামহের পুরানো কর্মচারী ও সেনাপতিদিগকে পদচ্যুত করিলেন। কুপ্রবৃত্তির উত্তেজক কতিপয় অল্পবয়স্ক দুষ্ক্রিয়াসক্ত ব্যক্তি তাঁহার প্রিয়পাত্র ও বিশ্বাসভাজন হইয়া উঠিল। তাহারা প্রতিদিন তাঁহাকে কেবল অন্যায্য ও নিষ্ঠুর ব্যাপারের অনুষ্ঠানে পরামর্শ দিতে লাগিল। ওই সকল পরামর্শের এই ফল দর্শিয়াছিল যে, তৎকালে প্রায় কোনো ব্যক্তির সম্পত্তি বা কোনো স্ত্রীলোকের সতীত্ব রক্ষা পায় নাই।' কাজেই বাঙ্গলার বিশিষ্ট ব্যক্তিরা যেমন জমিদার বা ধনী ব্যবসায়ীরা যাঁরা সিরাজের সঙ্গে নানা কাজে সম্পর্কিত ছিলেন, তাঁরা সিরাজের প্রতি অতিশয় বিরক্ত ছিলেন, তাঁরা কেউ সিরাজকে পছন্দ করতেন না। তাঁদের মধ্যে ছিলেন জগৎ শেঠ, উমি চাঁদ, মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র, শোভাবাজারের রাজা, সিরাজের সেনাপতি মিরজাফর প্রমুখ ব্যক্তি।

কলকাতার ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির সর্বাধিনায়ক রবার্ট ক্লাইভ বাঙ্গলার বিশিষ্ট ব্যবসায়ী ও জমিদারদের বাঙ্গলার নবাবের প্রতি অসন্তোষের এই সুযোগটিকে কাজে লাগিয়েছিলেন। এদের সঙ্গে যোগসাজস করে, গোপনে শলাপরামর্শ করে ঠিক হলো ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি সিরাজকে আক্রমণ ও নিহত করে মিরজাফরকে বাঙ্গলার মসনদে বসাবে। সিরাজের সেনাপতি মিরজাফর নবাব হওয়ার লালসায় যুদ্ধের সময় সিরাজের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করবে বলে রবার্ট ক্লাইভের সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ হয়েছিল। বাঙ্গলার এইসব বিশিষ্ট ব্যবসায়ী ও জমিদাররা ভেবেছিলেন নিষ্ঠুর, অত্যাচারী, লম্পট নবাব সিরাজের অপসারণ হলে তাঁদের ধনসম্পত্তি ও সম্ভ্রম রক্ষা পাবে; বাঙ্গলার জনগণও বাঁচবে। মহিলাদের মান ইজ্জত রক্ষা পাবে।

পরিকল্পনা মতো ১৭৫৭ সালের জুন মাসে মুর্শিদাবাদের পলাশীতে সিরাজদ্দৌলার সঙ্গে রবার্ট ক্লাইভের যুদ্ধ হয় এবং সিরাজের সেনাপতি মিরজাফরের বিশ্বাসঘাতকতার কারণে সিরাজ পরাজিত হন এবং যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পলায়ন করেন। পরে তিনি ধরা পড়েন এবং মিরজাফরের ছেলে মিরনের নির্দেশে মহম্মদ আলি বেগ নামে সিরাজের এক কর্মচারী তাঁকে হত্যা করে ১৭৫৭ সালের ২ জুলাই। সিরাজের রাজত্বের মেয়াদ ছিল ৯ এপ্রিল ১৭৫৬ থেকে ২৩ জুন ১৭৫৭ পর্যন্ত।

এটা ঠিক, সিরাজের মৃত্যুর পর ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি তাদের পছন্দ মতো ব্যক্তিদের বাঙ্গলার মসনদে বসিয়ে ছিল এবং ধীরে ধীরে সারা ভারতে তাদের প্রভাব বিস্তার করতে থাকল। অবশেষে ১৮৫৭ সালের মহাবিদ্রোহের পরে ভারতে পুরোপুরি ব্রিটিশ শাসন চালু হয়ে যায়। এই ইতিহাস আমাদের সবার জানা।

পরবর্তীকালে একদল ঐতিহাসিক ও লেখক এহেন অত্যাচারী ও লম্পট সিরাজকে একেবারে বাঙ্গলার হিরো এবং আইকন বানাবার জন্য উঠে পড়ে লেগেছিলেন এবং এখনো তার রেশ আছে। সিরাজকে নিয়ে উপন্যাস, কাব্য, নাটক ইত্যাদি লিখে বাঙ্গলার আকাশ বাতাস মুখরিত করে তোলা হয়েছিল। এর একমাত্র কারণ সিরাজের সঙ্গে ইংরেজদের যুদ্ধ হয়েছিল। কাব্যে বা নাটকে সিরাজকে এমন ভাবে দেখানো হয়েছে যেন সিরাজ ছিলেন এক মহান বাঙ্গালি হিরো এবং সিরাজের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে বাঙ্গলার স্বাধীনতা, বাঙ্গালির স্বাধীনতার সূর্য যেন চিরতরে অস্ত গেছে।

এই যে এত কাঁদুনি গাওয়া হয়েছে সিরাজকে নিয়ে, আচ্ছা বলুন তো বাঙ্গলার সমাজ ব্যবস্থায়, বাঙ্গলার মানুষের জীবনযাত্রার মানের উন্নতিতে সিরাজের কী অবদান রয়েছে? কিছু আছে কি আদৌ? এই যে বলা হচ্ছে সিরাজের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে বাঙ্গলার স্বাধীনতা সূর্য অস্ত গেছে, যদি প্রশ্ন করা যায়, আমরা তখন সত্যিই স্বাধীন ছিলাম? তখনও তো— তুর্কি, মুঘল, আফগান, পাঠান ইত্যাদি বর্বর নিষ্ঠুর অত্যাচারী মুসলমান শাসকদের অধীনে ছিল আমাদের দেশ। তাদের কাছে পরাধীন ছিলাম আমরা। ইংরেজ আসার ফলে আমাদের প্রভুর বদল হয়েছিল মাত্র। এখন কথা হলো তুলনামূলক ভাবে কোন প্রভুর আমলে আমরা বিশেষ করে হিন্দুরা মান, সম্ভ্রম, ধর্ম, নারীর ইজ্জত ইত্যাদি বজায় রেখে মানুষের মতো বাঁচতে পেরেছিলাম? কোন প্রভুর আমলে আমাদের পূর্বপুরুষরা আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে, আবার জগতে মাথা তুলতে আরম্ভ করেছিলেন? ইতিহাস সাক্ষী, ইংরেজ আমলেই তা হয়েছিল। মুসলমান শাসনকালে ভারতের হিন্দু সভ্যতা, হিন্দুদের শিক্ষা সংস্কৃতি অন্ধকারের অতল গহ্বরে তলিয়ে যাচ্ছিল। এই সত্যকে তো অস্বীকার করলে চলবে না। কাজেই সিরাজের পরাজয়ে ভারতের হিন্দু সমাজ কি ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা পায়নি? সিরাজের শাসন দীর্ঘায়িত হলে হিন্দু সমাজ সমূলে বিনাশ হতো। এই ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে বিচার করলে বলতে হবে, মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র সেই সময়ের প্রেক্ষিতে সিরাজদ্দৌলার বিরুদ্ধে এবং ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির পক্ষে গিয়ে হিন্দু সমাজকে রক্ষা করার কাজই করেছিলেন। মহাকালের বিচারে এটাই ছিল হিন্দুসমাজের ভবিতব্য। □

বাঙালি নারীর ভাবনায় বাংলা নববর্ষ

সুতপা বসাক ভড়

১৪৩১ বঙ্গাব্দের শুভ সূচনা আসন্ন। আমরা আমাদের ঐতিহ্যশালী নববর্ষকে বরণ করে নেওয়ার জন্য বেশ কয়েকদিন আগে থেকেই প্রস্তুত হতে থাকি। বাড়ি-ঘর পরিষ্কার করা, দরজায় আম্রপল্লব সজ্জা এখনও অনেকে করে থাকেন। বিশেষত ব্যবসায়ীদের দোকান ও বাড়িতে মূল প্রবেশদ্বারের দু'পাশে কলাপত্রিকা-সহ মঙ্গলঘট স্থাপন, আম্র পল্লবের সজ্জা, গণেশ-লক্ষ্মীর পূজা হয়ে থাকে। ওইদিন অনেকে গঙ্গাস্নানে যান। নতুন অথবা পরিষ্কার করে ধোয়া জামা-কাপড় পরে সকালে মন্দিরে পূজা দেওয়ার প্রচলন আছে। কলকাতায় দক্ষিণেশ্বর ও কালীঘাটে মায়ের পূজার জন্য উপচে পড়া ভিড় চোখে পড়ে। মূলত আপামর ব্যবসায়ীরা ওইদিন হালখাতা পূজা করাতে আসেন। মন্দির থেকে ফিরে মহিলারা রান্নাঘরের দিকে নজর দেন। এদিন সবার জন্য পারম্পরিক সুস্বাদু ব্যঞ্জন প্রস্তুত করা হয়ে থাকে। বিকেলবেলা সবাই একে অন্যকে নববর্ষের অভিবাদন জানান। এই উপলক্ষ্যে পরিবারের সকলে মিলে সান্ধ্য ভ্রমণে যাওয়ারও পরিকল্পনা করে থাকেন।

পশ্চিমবঙ্গ, অসম, ত্রিপুরার মতো বাঙ্গালি প্রধান রাজ্যগুলিতে এখনও পর্যন্ত বাংলা নববর্ষ পারম্পরিকভাবে পালিত হয় এবং এর কেন্দ্রে থাকেন বাড়ির মায়েরা। এদিন বাঙ্গালি নারীরা বাংলা নববর্ষের শুভ সূচনা করে থাকেন ঠাকুরের কাছে সকলের মঙ্গলকামনা করে—

সর্বে ভবন্তু সুখিনঃ সর্বে সন্তু নিরাময়াঃ।
সর্বে ভদ্রাণি পশ্যন্তু মা কশ্চিৎ দুঃখ ভাগভবেৎ।।

বাঙ্গলার মহারাজা শশাঙ্ক প্রবর্তিত এই নববর্ষের সূচনায় বাঙ্গালি নারীরা স্ব-বোধে অঙ্গীকারবদ্ধ হন যে, তাঁরা বাঙ্গালির এই গৌরবময় পরম্পরাকে যথাযথভাবে পালন করবেন এবং পরবর্তী প্রজন্মের কাছেও পৌঁছে দেবেন।

বাংলা বছরের সূচনা হয় বৈশাখ মাস দিয়ে; এরপর আসে জ্যৈষ্ঠ, আষাঢ়, শ্রাবণ, ভাদ্র, আশ্বিন, কার্তিক, অগ্রহায়ণ, পৌষ, মাঘ, ফাল্গুন ও চৈত্র। আমরা যতই তথাকথিত আধুনিক হই না কেন, বাংলা মাস, তিথি অনুসারেই আমাদের দিনচর্যা চলতে থাকে। যে কোনো শুভকার্যের দিন-ক্ষণের জন্য আমরা বাংলা পঞ্জিকা ও বাংলা ক্যালেন্ডারের ওপর সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করে থাকি। নববর্ষে অনেক ব্যবসায়ী তাঁদের দোকান অথবা প্রতিষ্ঠানের নাম-সহ নতুন ক্যালেন্ডার উপহার দিয়ে থাকেন। এছাড়া গুপ্ত প্রেস অথবা বেণীমাধব শীলের পঞ্জিকা বাঙ্গালি নারীর জীবনের অন্যতম অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। সারা বছরের কিছু বিশেষ দিন-ক্ষণকে স্মরণে রাখার জন্য বাংলা ক্যালেন্ডারে বিভিন্ন মাসের তিথিগুলি গোল দাগ দিয়ে, আমরা আমাদের সারা বছরের বিশেষ দিনগুলিকে মনে রাখি। বাঙ্গালি নারীর কাছে দৈনন্দিন কাজে পঞ্জিকার উপস্থিতি অত্যাবশ্যক।

আবার, ঋতু ও আবহাওয়া সম্বন্ধে আমাদের চিন্তাভাবনাও বঙ্গাব্দ কেন্দ্রিক; যেমন—গ্রীষ্মকাল অর্থাৎ বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ; বর্ষাকাল আষাঢ়-শ্রাবণ; শরৎকাল ভাদ্র-আশ্বিন; হেমন্তকাল কার্তিক-অগ্রহায়ণ; শীতকাল পৌষ-মাঘ এবং বসন্তকাল ফাল্গুন-চৈত্র। এই ছয় ঋতুর খেলা বঙ্গমাতার মধ্যে সুন্দর ও উপযুক্ত হয়ে পরিবেশিত হয় পঞ্জিকাকে বাঙ্গালি নারীরা অবলীলায় নিজেদের জীবনযাত্রায় ধারণ করে রেখেছেন।

মেলা প্রসঙ্গে আলোচনা করতে বসলে দেখতে পাই যে, বাড়ির মহিলারা পরিবারের সদস্যদের নিয়ে মেলায় যাওয়ার জন্য উৎসাহী থাকেন। বাঙ্গালি জীবনে মেলা হলো মনের মিলনের স্থল। এখানে সর্বস্তরের মানুষের আনাগোনা থাকে। প্রাণের বিনিময় ঘটে, ঘটে অর্থনৈতিক লেন-দেন। সারা বঙ্গে বিভিন্ন প্রান্তে বিভিন্ন মাসে কিছু নির্দিষ্ট তিথিকে কেন্দ্র করে বিশেষত পূর্ণিমা, সংক্রান্তির মতো সময়ে মেলা হয়, যেখানে সংসারের খুঁটিনাটি প্রয়োজনীয় দ্রব্যের সম্ভার থাকে। এখনও পর্যন্ত এগুলি স্বদেশি প্রাণশক্তিতে পরিপূর্ণ। সেজন্য বাঙ্গালি নারীর ভাবনায় মলের থেকে মেলার গুরুত্ব অনেক বেশি।

বর্তমানে বাংলা নববর্ষে উৎসবের মতো আনন্দের জোয়ারে গা-ভাসিয়ে দেওয়া পরিলক্ষিত হচ্ছে— যা বাহ্যিক। বঙ্গাব্দের মূল আন্তরিক ভাব-বৈশিষ্ট্য ধারণ করে আছে বাঙ্গালি মনন নববর্ষের উৎস পালনের মাধ্যমে, বাংলার মাস, ঋতু, পালাপার্বণ, মনসাপূজা, দুর্গাপূজা, পৌষসংক্রান্তি, দোলযাত্রা, রামনবমী, বাসন্তীপূজা, গাজন ইত্যাদির মাধ্যমে। বাঙ্গালি নারীরা এগুলি পালন করে থাকেন। তবে ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ এবং দেশের সর্বস্তরে এই গৌরবময় পরম্পরা ধরে রাখা এবং এগিয়ে নিয়ে যাবার আন্তরিক প্রচেষ্টা ও দায়িত্ব মহিলাদের প্রত্যেকের।

ভার্টিগো ও হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা

ডাঃ প্রকাশ মল্লিক

ভার্টিগো হলো মাথা ঘোরার অনুভূতি, যার সঙ্গে বমি বমি ভাব এবং চারপাশের সবকিছু ঘুরছে এমন অনুভূতি হতে পারে। ভার্টিগো বেশিরভাগ ক্ষেত্রে অভ্যন্তরীণ কানের সমস্যার কারণে ঘটে, যা মানুষের অঙ্গবিন্যাস ও ভারসাম্য বজায় রাখার জন্য দায়ী অঙ্গগুলির মধ্যে একটি। কখনও কখনও, এটি কোনও সংক্রমণের পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া বা দীর্ঘস্থায়ী প্রভাব হতে পারে বা এটি মস্তিষ্ককে প্রভাবিত করে এমন একটি অন্তর্নিহিত অবস্থা নির্দেশ করতে পারে। এর অন্তর্নিহিত কারণের উপর নির্ভর করে চিকিৎসার প্রয়োজন হতে পারে। ভার্টিগো আক্রান্ত ব্যক্তির চারপাশের পরিবেশ ঘুরছে এমন অনুভূতি হয়ে থাকে। এটি একটি গুরুতর স্বাস্থ্য সমস্যার লক্ষণ হতে পারে বা নাও হতে পারে।

ভার্টিগো দুই ধরনের হয়। যেমন পেরিফেরাল ভার্টিগো ও সেন্ট্রাল বা কেন্দ্রীয় ভার্টিগো। পেরিফেরাল ভার্টিগোর সবচেয়ে সাধারণ ধরন এবং সাধারণত যখন কোনও শারীরিক সমস্যা হয় তখন ঘটে। এক বা উভয় কানের অন্তঃকর্ণ, মানুষের শারীরিক ভারসাম্য বজায় রাখার জন্য এই অন্তঃকর্ণ এবং ভেস্টিবুলার নার্ভ অপরিহার্য। পেরিফেরাল ভার্টিগোর ধরনের অভিজ্ঞতার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত থাকতে পারে ল্যাবরেথাইটিস; মেনিয়ার ডিজিজ; ভেস্টিবুলার নিউরাইটিস; বিনাইন প্যারোক্সিসমাল পজিশনাল ভার্টিগো (বিপিপিভি)।

কেন্দ্রীয় ভার্টিগো পেরিফেরাল ভার্টিগোর তুলনায় কম সাধারণ এবং মস্তিষ্ককে প্রভাবিত করে এমন একটি অবস্থার কারণে ঘটতে পারে, যেমন সংক্রমণ, আঘাত, টিউমার গঠন বা স্ট্রোক। কেন্দ্রীয় ভার্টিগোতে আক্রান্ত ব্যক্তিরা ভার্টিগোর মতো উপসর্গগুলি অনুভব করতে পারেন তবে আরও গুরুতর আকারে, যেমন গুরুতর অস্থিরতা বা সোজা হয়ে দাঁড়াতে অক্ষমতা, যা তাঁদের হাঁটতে বাধা দিতে পারে।

ভার্টিগোর কারণ : ভিতরের কানের সমস্যাগুলি ভার্টিগোর সবচেয়ে সাধারণ কারণ হতে পারে, তবে ভার্টিগোর অন্যান্য কারণ রয়েছে। ভার্টিগোর কারণ ব্যক্তি ভেদে ভিন্ন হতে পারে। ভার্টিগোর কিছু সাধারণ কারণের মধ্যে রয়েছে স্ট্রোক; অ্যারিদ্‌মিয়া বা অনিয়মিত হৃদ্‌স্পন্দন; মাইগ্রেন; ডায়াবেটিস; মাথায় আঘাত; দীর্ঘক্ষণ ঘুমানো বা বিছানায় বিশ্রাম; কানের অস্ত্রোপচার; পেরিলিম্ফ্যাটিক ফিশ্চুলা (মধ্যম কার্ণের পাতলা ঝিল্লির ফুটো); কানের ভিতরে বা তার কাছাকাছি শিঙ্গলস; কিছু ওষুধ, যেমন অ্যান্টিবায়োটিক, অ্যান্টি-ইনফ্ল্যামেটরি ড্রাগ এবং কার্ডিওভাসকুলার ওষুধ; নিম্ন রক্তচাপ; সিফিলিসের মতো যৌনবাহিত রোগ; দ্রুত শ্বাস-প্রশ্বাস; অ্যাটাক্সিয়া বা পেশির দুর্বলতা; মেনিয়ার ডিজিজ; মাল্টিপল্ স্ক্লেরোসিস (এমএস); ভেস্টিবুলার নিউরাইটিস; বিনাইন প্যারোক্সিসমাল পজিশনাল ভার্টিগো এবং নিউরোমা।

মহিলাদের মধ্যে ভার্টিগোর কারণগুলির মধ্যে গর্ভাবস্থাও অন্তর্ভুক্ত থাকতে পারে, যা গর্ভাবস্থায় আরও স্পষ্ট হতে পারে প্রথম ত্রৈমাসিকে। অ্যানিমিয়াও যে কোনও বয়সের মহিলাদের ভার্টিগোর কারণ হতে পারে। তাছাড়া বয়স্কদের ক্ষেত্রে, ভার্টিগোর কারণগুলি তাঁদের ওষুধ বা নিয়ন্ত্রণহীন উচ্চ রক্তচাপকে দায়ী করা যেতে পারে। অন্যথায় একজন সুস্থ ব্যক্তির মধ্যে ভার্টিগো শুরু হলে মাথার হঠাৎ ঝাঁকুনি বা দ্রুত নড়াচড়া হতে পারে, যার ফলে ভেতরের কানের তরল সরে যায়।

ভার্টিগোর লক্ষণ : ভার্টিগোর উপসর্গগুলি মাথা ঘোরানো, কাত হওয়া, দুলতে বা ভারসাম্যহীন বোধ করার পাশাপাশি এক দিকে টানা অনুভূতি দ্বারা চিহ্নিত করা যেতে পারে। ভার্টিগোর লক্ষণগুলির সঙ্গে হতে পারে মাথা ঘোরা; বমি বমি ভাব এবং গা বমি; এক বা উভয় কানে শ্রবণশক্তি হ্রাস; অমিল; গতি অসুস্থতা; মাথা ব্যথা; টিনিটাস বা কানে বাজানো সংবেদন; নাইস্টাগমাস (দ্রুত, অনিচ্ছাকৃত চোখের নড়াচড়া); কানের পূর্ণতা বা ঠাসাঠাসি অনুভূতি।

ভার্টিগোর লক্ষণ ব্যক্তিভেদে পরিবর্তিত হতে পারে, অন্তর্নিহিত কারণের উপর নির্ভর করে। গর্ভবতী মহিলাদের মধ্যে, ভার্টিগোর লক্ষণগুলির মধ্যে মাথা ঘোরা অথবা বমি বমি ভাব অন্তর্ভুক্ত থাকতে পারে। ভার্টিগোর লক্ষণ এবং কারণের সময়কাল কয়েক মিনিট থেকে কয়েক ঘণ্টা পর্যন্ত হতে পারে।

বাড়িতে ভার্টিগোর চিকিৎসা : ভার্টিগো এড়ানো সবসময় সম্ভব নাও হতে পারে, তবে ভার্টিগোর লক্ষণগুলির জন্য কিছু ঘরোয়া প্রতিকার অনুসরণ করে এটি বাড়িতে পরিচালনা করা যেতে পারে। যেমন— চারপাশে চলাফেলা করা বা অন্যদের সহায়তায় বা স্টাফ ব্যবহার করে ধীরে ধীরে দাঁড়ানো। ঘূর্ণন বা ট্রিগার মুভমেন্ট এড়ানো; অন্ধকার জায়গায় শুয়ে পড়া বা ভার্টিগো অনুভব করার সময় লাইট বন্ধ করুন; মাথা ঘোরার অনুভূতি হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বসে পড়ুন; যোগব্যায়াম অনুশীলন করা, যা ভার্টিগো নিয়ন্ত্রণে সাহায্য করতে পারে; পর্যাপ্ত পরিমাণে ঘুমানো এবং স্ট্রেস ম্যানেজমেন্ট, যা ভার্টিগোর লক্ষণগুলিও কমাতে পারে; যে মহিলারা রক্তাল্পতার কারণে ভার্টিগো অনুভব করেন তাঁরা রক্ত উৎপাদনকারী পরিপূরক সমৃদ্ধ সুষম খাদ্য গ্রহণ করে উপকৃত হতে পারেন এবং আদা খেয়ে জলপান এবং হাইড্রেটেড থাকা।

বলাবাহুল্য, ভার্টিগো এমন একটি ঘটনা যা যে কাউকে প্রভাবিত করতে পারে। যদিও এটি সবসময় উদ্বেগের কারণ নাও হতে পারে এবং নিজে থেকেই সমাধান করতে পারে। দীর্ঘায়িত ভার্টিগো একটি অন্তর্নিহিত অবস্থা নির্দেশ করতে পারে। ভার্টিগো আক্রান্ত ব্যক্তিরা ঘাড় প্রসারিত করা এড়িয়ে চলুন। উদাহরণস্বরূপ, একটি উচ্চ শেলফ পর্যন্ত পৌঁছানোর সময়, দৈনন্দিন কাজকর্মের সময় আপনার মাথা সাবধানে এবং ধীরে ধীরে সরান। তাছাড়া এমন ব্যায়াম করুন যা আপনার ভার্টিগোকে ট্রিগার করে, যাতে আপনার মস্তিষ্ক এটিতে অভ্যস্ত হয়ে যায় এবং লক্ষণগুলি হ্রাস করে (আপনি পড়ে যাবেন না তা নিশ্চিত করার পরেই এটি করুন এবং প্রয়োজনে অন্যদের সাহায্য নিন)। চাপযুক্ত পরিস্থিতি এড়াতেও আপনার চেষ্টা করা উচিত, কারণ উদ্বেগ ভার্টিগোর লক্ষণগুলিকে আরও খারাপ করে তুলতে পারে। ভার্টিগোর ক্ষেত্রে হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা ফলপ্রসূ। □

khaitan
The name is enough
THERE'S ONE
FOR EVERYONE
khaitan (India) Limited
46C, J. L. Nehru Road, Kolkata - 700 071 (India)
Phone : 4050 5000 . Fax : 2288 3961.
Email : marketing@khaitan.com.
www.khaitan.com
khaitan CUSTOMER CARE
8584828210 7603060192
http://khaitan.onservice.in/callcenter/webres.aspx
customercare@khaitan.com | www.khaitan.com

শ্যামাপ্রসাদ সাভারকরের চেয়ে অন্য ধাতুতে গড়া ছিলেন। তিনি সাভারকরের মতো লড়াকু ছিলেন না, কিন্তু ছিলেন তুখোড় এক সংসদীয় রাজনীতিক।

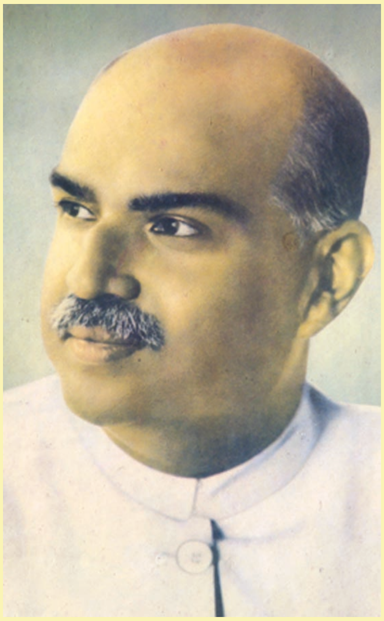

সাভারকর থেকে শ্যামাপ্রসাদ রাজনৈতিক হিন্দুত্বের ধারা

তথাগত রায়

হিন্দুত্ব ব্যাপারটা নিয়ে দেশ যে উত্থান-পতন দেখেছে তা সত্যিই চিত্তাকর্ষক। আজ থেকে ত্রিশ-চল্লিশ বছর আগে পর্যন্ত, অন্তত পশ্চিমবঙ্গে, নিজেকে হিন্দু বলা নিন্দিত ছিল। আমার মনে আছে, সেই সময়ে 'হিন্দু' বললে অনেকে খুব আশ্চর্য হয়ে বলত, এসব কী সাম্প্রদায়িক কথাবার্তা! আজকে আমরা অবশ্যই সেই জায়গায় নেই, আজকে আমরা স্বামীজীকে অনুসরণ করে বলি, 'আমি নিজেকে হিন্দু বলিতে গর্ব অনুভব করি'। আশ্চর্যের বিষয়, বিংশ শতাব্দীর প্রথম দুই দশক পর্যন্ত কিন্তু আমাদের মানসিকতা এই-ই ছিল। কী করে আমাদের মানসিকতা তারপর বিকৃত হলো এবং পরে আবার কী করে যথাস্থানে ফিরে এল, তাই নিয়েই এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধ।

আমরা অনেকেই জানি না যে 'হিন্দুত্ব' শব্দটির উদ্ভাবক একজন বাঙ্গালি হিন্দু। তাঁর নাম চন্দ্রনাথ বসু (১৮৪৪-১৯১০)। ইনি হুগলী জেলার মানুষ ছিলেন এবং একটি বইয়ে এই কথাটি ব্যবহার করেছেন। কিন্তু শব্দটিকে সাধারণ্যে পরিচিত করার কৃতিত্ব আমাদের বহু পরিচিত বিনায়ক দামোদর সাভারকরের, যাঁকে আমরা বীর সাভারকর বলেই জানি। ঘটনাবহুল জীবনে সাভারকর বিলেতে পড়াশোনা করেছেন, সেখানে গ্রেপ্তার হয়েছেন, তারপর মারসাইল নামক ফরাসি বন্দরে জাহাজ থেকে ঝাঁপিয়ে সাঁতার কেটে পালাবার চেষ্টা করেছেন। শেষপর্যন্ত আন্দামানে নির্বাসিত হয়েছেন এবং সেখানে সেডিস্ট ব্রিটিশ জেলারদের হাতে নরকযন্ত্রণা ভোগ করেছেন। তারপর রত্নাগিরি জেলে স্থানান্তরিত হয়েছেন এবং সেখান থেকে মুক্তি পেয়ে হিন্দু মহাসভার দায়িত্ব নিয়েছেন এবং এই সংস্থাটিকে হিন্দুত্ববাদী রাজনীতির কেন্দ্র হিসেবে তৈরি করেছেন।

১৯৩৭ সালের জুন মাসে সাভারকর রত্নাগিরি জেল থেকে মুক্তি পান। দীর্ঘ কারাবাসের ফলে সাভারকরের স্বাস্থ্য একেবারে ভেঙে গিয়েছিল, কিন্তু তা তাঁকে দমিয়ে রাখতে পারেনি। মুক্তি পেয়েই তিনি নিজের কাজে ঝাঁপিয়ে পড়লেন এবং 'হিন্দুত্ব' ব্যাপারটাকে একটা রাষ্ট্রবাচক সংজ্ঞা দিতে উদ্যোগী হলেন। তাত্ত্বিক দিক দিয়ে দেখতে গেলে সাভারকরের জীবনের এই সময়টা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সাভারকরের চিন্তায় 'হিন্দুইজম' বা 'হিন্দুধর্ম' ছিল ধর্মভিত্তিক চিন্তার ফসল, কিন্তু হিন্দুত্ব তা নয়। 'হিন্দুত্ব' শব্দটি পুরোপুরিভাবে রাষ্ট্রচিন্তার ফসল এবং এটি একটি সাংস্কৃতিক ধারণা। তিনি যখন হিন্দু মহাসভার দায়িত্বভার গ্রহণ করেন তখন বলেন, এটি কোনো হিন্দু ধর্মসভা নয়, এটি হিন্দু রাজনৈতিকসভা। সাভারকরের প্রধান সংগ্রাম ছিল মোহনদাস গান্ধীর 'হিন্দু-মুসলমান একতা'-র মেকি ধারণার বিরুদ্ধে। এখন আমাদের এই ধারণার দিকে তাকাতে হবে।

গান্ধী এই প্রক্রিয়া আরম্ভ করেছিলেন বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকের

শেষের দিকে। তার আগে গান্ধী পুরো ব্রিটিশভক্ত ছিলেন— প্রথম মহাযুদ্ধের শেষের দিকে তিনি যে ব্রিটিশ বাহিনীর জন্য গ্রামে গ্রামে ঘুরে সৈন্যসংগ্রহ করে বেড়িয়েছেন একথা তাঁর নিজের নাতি রাজমোহন গান্ধী কবুল করেছেন। যাক সে কথা। এই দশকের শেষের দিকে গোখলে এবং তিলকের মৃত্যুর ফলে গান্ধী বুঝেছিলেন রাজনীতির জগতে একটা শূন্যতার সৃষ্টি হতে চলেছে এবং সেই শূন্যতা তিনিই পূরণ করতে পারেন। সেজন্য তিনি স্বাভাবিক পরিচ্ছদ ছেড়ে হেঁটো ধুতি ও খালি গায়ে থাকা সাব্যস্ত করলেন এবং সাধুসন্ন্যাসীর প্রতি হিন্দুদের যে স্বাভাবিক শ্রদ্ধা আছে সেটা আশ্রয় করে হিন্দুদের মন জয় করে নিলেন। মন্ত্র তৈরি করলেন অহিংস অসহযোগ এবং হিন্দু-মুসলমান একতা।

এই পর্যন্ত ঠিকই ছিল। হিন্দু-মুসলমান একতা যে অত্যন্ত খাসা জিনিস তা বলার অপেক্ষা রাখে না। কিন্তু এটি রূপায়ণ করার জন্য গান্ধী যে উপায় অবলম্বন করলেন তা যেমনি বিস্ময়কর তেমনি হিন্দুদের পক্ষে লজ্জাজনক। গান্ধী ভালোই জানতেন মুসলমান তাদের ধর্মবিশ্বাস এবং 'জিহাদ', 'কাফের' ইত্যাদি ধারণা থেকে একচুল নড়বে না। তাই তিনি ফতোয়া দিলেন যে নড়তে হিন্দুদেরই হবে এবং মুসলমানের কোনো কুকীর্তির সমালোচনা করা কখনোই চলবে না। আশ্চর্যের বিষয়, গান্ধীর জনমোহিনী ক্ষমতা (যদিও শুধু হিন্দুদের মধ্যে সীমিত) এমনি ছিল যে ভারতের হিন্দুরা এই বিচিত্র তত্ত্ব গিলে ফেলল।

আর মুসলমানেরা দেখল, এর চেয়ে কাম্য অবস্থা আর কী হতে পারে? এক হিন্দু নেতাই আমাদের সবরকম কুকাজ করার স্বাধীনতা দিয়ে বসে আছেন। অতএব তাদের যা প্রাণে চায় তাই করতে লাগল। মালাবার অঞ্চলে (বর্তমান উত্তর কেরালা) একদল ধর্মান্ধ মোপলা দশ হাজার হিন্দুকে হত্যা করল। কংগ্রেস নেত্রী অ্যানি বেসান্ত (ইংরেজ মহিলা) এর কড়া নিন্দা করলেন। কিন্তু গান্ধী বললেন, এই মোপলারা অত্যন্ত সাহসী ও ধর্মভীরু, তাদের ধর্মে যা বলেছে তারা তাই করেছে। ভারতে যে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার পরম্পরা আরম্ভ হলো তার শুরু এখান থেকেই।

সাভারকরের বিদ্রোহ ছিল এই মুসলমানের কাছে সবসময় নতজানু হওয়ার বিরুদ্ধে এবং হিন্দুদের মাথা তুলে দাঁড়ানোর সপক্ষে। কিন্তু যখন সাভারকর জেল থেকে ছাড়া পেয়ে রাজনীতি আরম্ভ করেছেন সেই সময় গান্ধীর কর্তৃত্ব এমন সর্বময় যে তিনি নিজের মতবাদ প্রচার করতে গিয়ে প্রচুর হেনস্থার সম্মুখীন হয়েছিলেন। কিন্তু এই হেনস্থা ও নিজের ভগ্নস্বাস্থ্য সত্ত্বেও নিজের লড়াইয়ে যতি দেননি এই অসমসাহসী পুরুষ।

শ্যামাপ্রসাদের রাজনীতিতে প্রবেশ সাভারকরের মাত্র দুই বছর পরে। তখন পর্যন্ত শ্যামাপ্রসাদ পুরোপুরি শিক্ষাজগতের মানুষ ছিলেন এবং কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যদের মধ্যে সবচেয়ে কম বয়সে সেই পদ অলংকৃত করেছিলেন। কিছু অদ্ভুত ঘটনার দুর্ভাগ্যকর সম্মিলনের ফলে তাঁকে রাজনীতিতে আসতে হয়। ব্যাপারটা ছিল এইরকম। ১৯৩৫ সালে ব্রিটিশ পার্লামেন্টে 'গভর্নমেন্ট অব ইন্ডিয়া অ্যাক্ট ১৯৩৫' নামে এক আইন পাশ হয়, যার ফলে কিছু শাসনক্ষমতা প্রদেশগুলিতে ভারতীয়দের কাছে হস্তান্তরিত হয়, যদিও ইংরেজ গভর্নরের সম্মতিই ছিল শেষ কথা। এই আইনের জেরে ১৯৩৭ সালের ব্রিটিশ ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে নির্বাচন হয় এবং বাঙ্গলার নির্বাচনে কোনো পার্টিই নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা পায়নি। এই সময় পার্টি ছিল তিনটি— কংগ্রেস, মুসলিম লিগ ও কৃষক প্রজা পার্টি। হিন্দুদের ১০০ শতাংশ সমর্থন ছিল কংগ্রেসের দিকে, সামান্য কিছু মুসলমানও কংগ্রেসকে সমর্থন করত, যদিও কংগ্রেস বলে বেড়াত তারা হিন্দু-মুসলমানের মিলিত পার্টি। মুসলিম লিগ ছিল ঘোষিতভাবে মুসলমানদের সাম্প্রদায়িক পার্টি, যদিও এর সমর্থন ছিল প্রধানত উচ্চবিত্ত মুসলমানদের তরফ থেকে। আর কৃষক প্রজা পার্টি, যার নেতা ছিলেন ফজলুল হক, ছিল নিম্নবিত্ত, প্রধানত মুসলমান চাষিদের পার্টি। এই পার্টি মুসলিম লিগের মতো এমন ঘোষিতভাবে সাম্প্রদায়িক ছিল না।

এই অবস্থায় কংগ্রেসের উচিত ছিল এই পার্টির সঙ্গে মিলিজুলি সরকার গঠন করা। ফজলুল হকও কংগ্রেসের সঙ্গে সরকার গঠন করতে খুবই আগ্রহী ছিলেন। কিন্তু কোনো রহস্যময় কারণে (যার কারণ হতে পারে বাঙ্গালি-বিদ্বেষ) কংগ্রেস কিছুতেই হক সাহেবের সঙ্গে হাত মেলাল না, যার ফলে তিনি মুসলিম লিগের সঙ্গে সরকার করতে বাধ্য হলেন। এর ফলে তৈরি হলো এক চরম মুসলমান সাম্প্রদায়িক সরকার, যার অধীনে হিন্দুরা অসম্ভব বঞ্চনার শিকার হলো। হিন্দুদের পক্ষে সরকারি চাকরি পাওয়া প্রায় বন্ধই হয়ে গেল। কংগ্রেস এই ব্যাপারে হিন্দুদের কোনো রকম সাহায্য করল না, কারণ তাদের সেই চিরাচরিত বুলি— 'কংগ্রেস হিন্দু-মুসলমানের মিলিত পার্টি'। তখন বাঙ্গলার কিছু হিন্দুহিতৈষী নেতা, যেমন জাস্টিস মন্মথনাথ মুখোপাধ্যায়, আশুতোষ লাহিড়ী, নির্মলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এবং ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘ প্রতিষ্ঠাতা স্বামী প্রণবানন্দ শ্যামাপ্রসাদকে অনুরোধ করলেন বাঙ্গালি হিন্দুদের নেতৃত্ব দিতে। শ্যামাপ্রসাদ রাজি হলেন এবং ১৯৩৯ সালে নেতৃত্বে এলেন।

শ্যামাপ্রসাদ সাভারকরের চেয়ে অন্য ধাতুতে গড়া ছিলেন। তিনি সাভারকরের মতো লড়াকু ছিলেন না, কিন্তু ছিলেন তুখোড় এক সংসদীয় রাজনীতিক। তিনি কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভায় সদস্য হয়েছিলেন, কিন্তু ১৯৪৮ সালে কিছু বিষয়ে মতানৈক্য হওয়ায় হিন্দু মহাসভা ত্যাগ করেন। তাঁর পরিচয় দেশ পেয়েছিল তাঁর ১৯৫২ সালের নির্বাচনে জিতে সাংসদ হবার পরে, যখন তিনি পূর্ববঙ্গের হিন্দুহত্যা, কাশ্মীরের পরিস্থিতি ও অন্যান্য বিষয় সম্বন্ধে জওহরলাল নেহরুকে নাকের জলে চোখের জলে করেছিলেন। শেষপর্যন্ত নেহরু ও শেখ আবদুল্লার ষড়যন্ত্রে তাঁকে কাশ্মীরের কারাগারে প্রাণত্যাগ করতে হয়, যার একটা তদন্ত পর্যন্ত করতে নেহরু রাজি হননি।

শ্যামাপ্রসাদ সম্বন্ধে সবিস্তারে বলার পরিসর এখানে নেই। তিনি ১৯৪০ সালে ফজলুল হককে মুসলিম লিগের খপ্পর থেকে টেনে বার করেছিলেন এবং একটি মন্ত্রীসভা তৈরি করেছিলেন যার নামই হয়ে গিয়েছিল শ্যামা-হক মন্ত্রীসভা। কুচক্রী ইংরেজ গভর্নর হারবার্টের চক্রান্তে এই মন্ত্রীসভা টিকতে পারেনি। তারপর তিনি ১৯৪৩ সালের দুর্ভিক্ষে অসাধারণ ত্রাণকাজ করেছিলেন এবং ১৯৪৭ সালে তাঁর জীবনের মহত্তম কীর্তি— হিন্দু বাঙ্গালির বাসভূমি হিসেবে পাকিস্তানে কবল থেকে ছিনিয়ে বঙ্গ বিভাগ করে পশ্চিমবঙ্গের সৃষ্টি। শেষপর্যন্ত ১৯৫০ সালে যখন পূর্ব পাকিস্তান পাইকারি হারে হিন্দুহত্যা আরম্ভ করল এবং সে বিষয়ে নেহরু কিছু করতে রাজি হলেন না, তখন শ্যামাপ্রসাদ কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভা থেকে ইস্তফা দিয়ে নতুন পার্টি গঠন করলেন, যার নাম ভারতীয় জনসঙ্ঘ। এই ভারতীয় জনসঙ্ঘই পরবর্তীকালে ভারতীয় জনতা পার্টির নামে আত্মপ্রকাশ করে। ■

শাশ্বত ভারতের জাগ্রত বিবেক

স্বামীজীর হিন্দুরাষ্ট্র ভাবনা

অংশুমান গঙ্গোপাধ্যায়

স্বামী বিবেকানন্দ হলেন শাশ্বত ভারতের জাগ্রত বিবেক। তাঁর মধ্যে প্রোথিত এক ‘ঘনীভূত ভারতবর্ষ’। এই ঘনীভূত ভারতের সাক্ষাৎ প্রতিমূর্তি স্বামীজী যে আদর্শের জন্য জীবন ধারণ করেছিলেন, যে-আদর্শের জন্য কাজ করে গিয়েছেন এবং যে-আদর্শের পূর্তির উদ্দেশ্যে মহাসমাধি লাভ করেছেন, সেই আদর্শ হলো হিন্দু রাষ্ট্রচিন্তা। স্বামীজীর অভিলাষিত এবং তাঁর প্রচারিত ‘নবজাগ্রত ভারতের’ আদর্শের প্রতি তাঁর ও তাঁর প্রতিষ্ঠিত রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের সকল সন্ন্যাসী ও ব্রহ্মচারীবৃন্দের একাগ্র নিষ্ঠা এবং স্বামীজীর মতাদর্শে প্রভাবিত অসংখ্য সংগঠন ও অগণিত কার্যকর্তাদের অসামান্য আত্মোৎসর্গের ফলেই আধুনিক ভারতের পক্ষে ভারতীয় রাষ্ট্রচিন্তা এবং সেই চিন্তাপ্রসূত কর্তব্য ও কর্মসূচি রূপায়ণের গুরুভার বহন করা সম্ভব হয়েছে। বৈভবশালী হিন্দুরাষ্ট্রের গৌরবময় অতীত, মূল্যবোধহীনতায় আক্রান্ত বর্তমান এবং উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ সম্পর্কে স্বামীজীর মৌলিক চিন্তাধারাই ভারতীয় রাষ্ট্রভাবনার উপজীব্য। নব চেতনায় জেগে ওঠার জন্য ভারতজননীর সন্তানদের প্রতি তাঁর উদাত্ত আহ্বান ও পথনির্দেশ আজ সমগ্র ভারতবাসীর এগিয়ে চলার পাথেয়। আজ যখন সমগ্র দেশ জুড়ে শ্রীরামকৃষ্ণ ভাব আন্দোলনের ফলে স্বামীজীর পবিত্র স্মৃতির প্রতি ভক্তিপূর্ণ অর্ঘ্য নিবেদনের জন্য ব্যাপক উৎসাহ-উদ্দীপনা পরিলক্ষিত হচ্ছে, ভারতবাসীর মধ্যে মনুষ্যত্ব, সেবা ও ত্যাগের ভাব ধীরে ধীরে জাগ্রত হচ্ছে, তখন এই মাহেন্দ্রক্ষণে মাতৃভূমির প্রতি আপামর ভারতবাসীর মননে-চিন্তনে স্বীয় কর্তব্য সম্পন্ন করার প্রেরণা সঞ্চারিত হওয়া যেন সময়ের অপেক্ষা।

স্বামী বিবেকানন্দ কয়েক শতাব্দীর মধ্যে প্রথম হিন্দু পরিব্রাজক, যিনি বহির্বিশ্বে পরিভ্রমণ করে সনাতন হিন্দুত্বের বাণী প্রচারের দ্বারা বিশ্ববাসীকে উদ্বুদ্ধ করেন। তিনি শুধুমাত্র দেশপ্রেমিক, সমাজ সংস্কারক ও সংগঠকই ছিলেন না, তিনি রাষ্ট্রের পুনর্জাগরণের শক্তিগুলিকে সঙ্ঘবদ্ধ করেন এবং ব্রিটিশ শাসনের প্রচণ্ড আঘাত ও জিঘাংসার ফলে দেশ যখন বিচ্ছিন্ন ও মনোবলহীন হয়ে পড়েছিল, তখন তিনিই সর্বপ্রথম দেশের পুনর্গঠনের কাজে ব্রতী হওয়ার লক্ষ্যে ভারতবাসীর হৃদয়ে প্রেরণার সঞ্চার করেন। তিনিই ভারতের প্রাণকেন্দ্রস্বরূপ ‘ধর্ম’ সম্পর্কে দেশবাসীকে সচেতন করে পুনরভ্যুদিত ভারতের ভিত্তি প্রতিষ্ঠা করেন। দৃপ্ত কণ্ঠে তিনি ঘোষণা করেন, একমাত্র ধর্মকে কেন্দ্র করেই তার চতুর্দিকে হিন্দুরাষ্ট্রকে সার্থকভাবে ও লক্ষ্যসাধনের পথে পুনর্গঠিত করা যেতে পারে। ‘দেশ’ নামক ভূমিখণ্ডের প্রতি সেই দেশে জন্মগ্রহণ করা অধিবাসীদের মাতা-পুত্রের মতো পবিত্র সম্পর্ক এবং সেই সম্পর্ক রক্ষার স্বার্থে দেশবাসীর সংকল্প ও সমর্পণের ভাব হলো ‘রাষ্ট্রীয়তা’। দেশের ভূমিপুত্রদের সঙ্গে ভারতজননীর আত্মীয়তার অটুট, অমোঘ বন্ধন হলো রাষ্ট্রবোধ। ‘রাষ্ট্র’ হলো সেই ভাব যা দেশবাসীকে স্বদেশ কল্যাণে ব্রতী করে, দেশের সুখে তার মনে জাগে হর্ষ, দেশের দুঃখে তার হৃদয় হয়ে ওঠে বিষাদগ্রস্ত। দেশের সভ্যতা-সংস্কৃতির জ্ঞান আহরণ করে, সেই সংস্কৃতি উদ্‌যাপন করা, সেই দেশজ সংস্কৃতির গর্বে গর্বিত হওয়া, দেশীয় সংস্কৃতির অধ্যয়ন - উদ্‌যাপনে আত্মসম্মান, আত্মমর্যাদার অনুভব হলো রাষ্ট্রচিন্তা। দেশ পরাধীন হলেও রাষ্ট্রবোধ কোনো দিনই ক্ষুণ্ণ হয়নি। ভারতবর্ষের মানুষ সনাতন ধর্মকে আলিঙ্গন করে, সেই ধর্মের অগণিত রূপ ও আঙ্গিক অনুশীলন করে প্রজন্ম হতে প্রজন্মান্তরে আহরণ করেছে রাষ্ট্রবোধ, সনাতন ধর্মের অক্ষয় বাণীর মর্ম উপলব্ধি করে তাদের মধ্যে সঞ্চারিত হয়েছে যে চেতনা, সেই চেতনা হলো হিন্দু রাষ্ট্রচিন্তা। স্বামীজীর শিক্ষায় রাষ্ট্রচিন্তার এই হলো সারসংক্ষেপ। এই বিষয়ে তাঁর প্রদত্ত মহান মন্ত্রটি হলো— ঈশ্বরে বিশ্বাস, নিজের উপর বিশ্বাস। নিজের উপর বিশ্বাস, উপনিষদের যে-সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত তাহা— ‘আমিই আত্মা। খড়্গ আমাকে দ্বিখণ্ডিত করিতে পারে না, কোনো অস্ত্র ভেদ করিতে পারে না, আগুন দহন করিতে পারে না, বাতাস শুষ্ক করিতে পারে না। আমি সর্বব্যাপী, আমি অনন্ত। আমি সর্বজ্ঞ’। এই মহামন্ত্রই স্বামীজী অবিরাম দেশবাসীর কর্ণকুহরে নিনাদিত করেছিলেন। তিনি যা কিছু বলেছিলেন, প্রচার করে গিয়েছেন, সেই সমস্ত গীতি-মন্ত্রের এটিই হলো মূল সুর। এই সত্যের অন্তর্নিহিত মর্ম উপলব্ধি করে সেই অনুযায়ী জীবন যাপনে প্রয়াসী হওয়ার সময় আজ আগত। স্বামীজী প্রদর্শিত এই পথে অগ্রসর হলে, পৃথিবীর কোনো শক্তিই ভারতের ক্ষতি সাধন করতে

পারবে না।

বর্তমান পরিস্থিতিতে স্বামীজীর বাণী যেন এক নতুন আলোকে উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে। কারণ তাঁর বাণী ছিল দেহের, মনের ও আত্মপ্রত্যয়ের শক্তির বাণী। স্বামীজী চেয়েছিলেন 'লোহার মাংসপেশী ও ইস্পাতের স্নায়ু যাহার মধ্যে বিরাজ করিবে এমন এক মন যাহা বজ্রের উপাদানে নির্মিত'। তিনি চেয়েছিলেন তাঁর দেশবাসী 'শক্তি, পৌরুষ, ক্ষাত্র-বীর্য ও ব্রহ্মতেজ'-এর অধিকারী হোক ও এগুলি নিজেদের মধ্যে আত্মস্থ করুক। বর্তমান ভারতের আভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক যাবতীয় সংকটের পরিস্থিতিতে এই গুণগুলিই সর্বাপেক্ষা প্রয়োজন, কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত জৈবিক সুখভোগের বিদেশি আদর্শ এবং পার্থিব, বস্তুবাদী দৃষ্টিভঙ্গীর প্রভাবে স্বাধীনোত্তর কালে অধিকাংশ ভারতবাসী এই অতি প্রয়োজনীয় গুণগুলিকে উপেক্ষা করেছে। আজ যখন দেশ জুড়ে প্রাদেশিকতা, আঞ্চলিকতা, বিচ্ছিন্নতাবাদ, সন্ত্রাসবাদ ও জেহাদ মাথাচাড়া দিচ্ছে, তখন দেশের স্বাধীনতা, অখণ্ডতা, সার্বভৌমত্ব, ভারতীয় জীবন-প্রণালী, দেশের ভবিষ্যৎ, সংহতি ও স্বধর্মকে রক্ষার জন্য জাতির জীবনের এই কঠিন মুহূর্তে ভারতবাসীর স্নায়ুগুলিকে ইস্পাত-কঠোর করে তুলতে, প্রতিটি ভারতীয়ের সংকল্পের শক্তিকে দৃঢ়তর করে তুলতে স্বামীজীর বাণী যে অত্যন্ত মূল্যবান ও বিশেষ কার্যকরী তা অনস্বীকার্য। স্বামীজী প্রদত্ত শিক্ষা অনুযায়ী রাষ্ট্রীয়তা ও জাতীয়তাবোধ সমার্থক। বার বার তিনি প্রচার করেছেন যে 'ভারতের ইতস্তত বিক্ষিপ্ত আধ্যাত্মিক শক্তিগুলির সমন্বয় সাধনেই রাষ্ট্রীয় ঐক্য প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে'। তিনি মনে করতেন, 'যাহাদের হৃদয়তন্ত্রী একই আধ্যাত্মিক সুরে ঝঙ্কৃত হইয়া উঠে, তাহাদের সঙ্ঘই ভারতরাষ্ট্র বলিয়া অভিহিত হইতে পারে'।

স্বামীজী দেশবাসীকে আর একটি বাণী শুনিয়েছেন। তিনি ভারতবাসীকে তামসিকতা ত্যাগ করতে বলেছেন, কারণ তামসিকতা (নিদ্রা, আলস্য, ভয়) হতে সমস্ত পাপের জন্ম হয়, যেমন দৌর্বল্য, কুসংস্কার, মনের সংকীর্ণতা, তুচ্ছ বিষয়ে পরস্পরের মধ্যে কলহ ও রেষারেষি প্রভৃতি। এই সমস্ত পাপ ত্যাগ করে ভারতীয়দের ঐক্য ও সংগঠনের সুদৃঢ় শিলাস্তূপের ওপর দাঁড়িয়ে প্রচণ্ড শক্তি সঞ্চয় করতে হবে। এইভাবে ব্যক্তিগত ও বিভিন্ন ইচ্ছাশক্তির সমন্বয় সাধনের দ্বারা ভারতীয়রা তাদের অতীতের অপেক্ষাও বহুগুণ উজ্জ্বলতর ভবিষ্যৎ গড়ে তুলতে সক্ষম হবে। এই ভবিষ্যৎ তাদের স্বরাষ্ট্র ও সুরাষ্ট্র প্রাপ্তিতে সহায়ক হবে। রাষ্ট্রবিরোধী শক্তিদের যেহেন সম্মিলিত ষড়যন্ত্রের সম্মুখীন আজ ভারত হয়েছে, সেই সংকটের সময়েই জাতিকে তার ভুলের হিসেব-নিকেশ ও আত্মসমীক্ষা করতে হবে।

সংগঠন, নেতৃত্ব, প্রকৃত আচার্য ও সফলতার রহস্য বা কর্মযোগের বিষয়ে স্বামীজীর নানান উপদেশাবলী পাঠ করলে পাওয়া যায় এক আত্মবিশ্বাসের সন্ধান। স্বামীজী বলছেন, 'আমার কথা বিশ্বাস কর, তখনই— কেবল তখনই তুমি প্রকৃত হিন্দুপদবাচ্য, যখন মাত্র ওই নামটিতেই তোমার ভিতরে বৈদ্যুতিক শক্তি সঞ্চারিত হইবে। তখনই— কেবল তখনই তুমি হিন্দুপদবাচ্য, যখন হিন্দুনামধারী যে কোনো ব্যক্তির দুঃখ কষ্ট তোমার হৃদয় স্পর্শ করিবে আর তুমি নিজ সন্তান বিপদে পড়িলে যেরূপ উদ্বিগ্ন হও, তাহার কষ্টেও সেইরূপ উদ্বিগ্ন হইবে। তখনই— কেবল তখনই তুমি হিন্দুপদবাচ্য, যখন তুমি মহান গুরুগোবিন্দ সিংহের মতো সর্বপ্রকার অত্যাচার, নির্যাতন সহ্য করিতে প্রস্তুত হইবে'। যে হিন্দুরাষ্ট্র বিশ্বজনীন আধ্যাত্মিকতার উৎস সেই বিষয়ে আলোকপাত করে স্বামীজী বলছেন, 'এই সেই প্রাচীনভূমি, যে-স্থান হইতে উৎসারিত হইয়াই তত্ত্বজ্ঞান পরবর্তীকালে অন্যান্য দেশে প্রসার লাভ করিয়াছিল; এই সেই ভারতভূমি, বস্তুজগতে যে-ভূমির আধ্যাত্মিকতার বিচ্ছুরণ সাগরসদৃশী প্রবহমনা স্রোতস্বিনীর সহিত উপমেয়; এই সেই ভারতভূমি, যেখানে অনন্ত হিমালয় স্তরে স্তরে উত্থিত হইয়া তুষারশৃঙ্গের দ্বারা যেন স্বর্গরাজ্যের রহস্যনিচয়ের প্রতি দৃষ্টিপাত করিতেছে; এই সেই ভারত যে-দেশের মৃত্তিকা শ্রেষ্ঠ ঋষিমুনিদের পদধূলিতে পবিত্রীকৃত। এইখানেই সর্বপ্রথম মনুষ্যের যথার্থ স্বরূপ ও অন্তর্জগতের রহস্য সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা উদিত হইয়াছিল। এইখানেই আত্মার অমৃতত্ব, অন্তর্যামী ঈশ্বরের অস্তিত্ব এবং জীব ও জগতে অনুস্যূত পরমাত্মার সুমহান তত্ত্বের প্রথম উদ্ভব। ধর্ম ও দর্শনের সর্বোচ্চ আদর্শসকল এইখানেই চরম পরিণতি লাভ করিয়াছিল। এই সেই ভূমি, যেখান হইতে ধর্ম ও দার্শনিক তত্ত্বসমূহ বন্যার মতো প্রবাহিত হইয়া সমগ্র পৃথিবীকে প্লাবিত করিয়াছে'। অনন্তকাল ব্যাপী মৃত্যুঞ্জয়ী ভারতের জয়ঘোষ ধ্বনিত হয়েছে তাঁর বাণীতে। তিনি বলছেন, 'রোম যখন ভবিষ্যতের অন্ধকারে লুক্কায়িত ছিল, যখন ইওরোপীয়দের পূর্বপুরুষেরা জার্মানির গভীর অরণ্যে অসভ্য অবস্থায় নীলবর্ণে নিজেদের রঞ্জিত করিত, তখনও ভারতের কর্মশক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। আরও প্রাচীনকালে— ইতিহাস যাহার কোনো সংবাদ রাখে না, কিংবদন্তীও সে সুদূর অতীতের ঘনান্ধকারে দৃষ্টিপাত করিতে সাহস করে না— সেই অতি প্রাচীনকাল হইতে বর্তমান কাল পর্যন্ত ভাবের পর ভাবের তরঙ্গ ভারত হইতে প্রসারিত হইয়াছে, কিন্তু উহার প্রত্যেকটি তরঙ্গই শান্তি ও পশ্চাতে আশীর্বাণী লইয়া অগ্রসর হইয়াছে। পৃথিবীর সকল জাতির মধ্যে কেবল আমরাই কখনও অপর জাতিকে যুদ্ধ বিগ্রহের দ্বারা জয় করি নাই। সেই শুভ কর্ম আমরা এখনও বহন করিতেছি'। দেশবাসীর উন্নতিকল্পে স্বামীজী বলেছেন, 'প্রত্যেক জাতি, প্রত্যেক নরনারী নিজের উদ্ধার নিজেই সাধন করিয়া থাকে। তাহাদের এইটুকু সাহায্য করিতে হইবে, তাহাদিগকে কতকগুলি উচ্চ ভাব দিতে হইবে। অবশিষ্ট যাহা কিছু, তাহা উহার ফলস্বরূপ আপনিই আসবে। আমাদের কার্যের এই মূল কথাটা সর্বদা মনে রাখিবে— ধর্মে একবিন্দুও আঘাত না করিয়া জনসাধারণের উন্নতি বিধান'। দরিদ্রের কুটিরে রাষ্ট্রের প্রকৃত অবস্থান এবং সেখান থেকে রাষ্ট্রজীবনের অমৃতধারার নির্গমনের বাণী তন্দ্রাচ্ছন্ন ভারতের জাগরণের সহায়ক শক্তি। এই বিষয়টি উপস্থাপিত হয়েছে স্বামীজীর ভাষ্যে, 'Let new India arise in your place. Let her arise out of the peasants' cottage, grasping the plough; out of the huts of the fishermen, the cobbler and the sweeper. Let her spring from the grocer's shop, from beside the oven of the fritter-seller. Let her emanate from the factory, from marts and from markets. Let her emerge from groves and forests, from hills and mountains.' স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্বহীন তৎকালীন ভারতবর্ষের মানুষের এক ও একমাত্র আরাধ্যা দেবী হলেন ভারতমাতা। এই আধ্যাত্মিক ভাবনা দান করে বেদান্তবীর সন্ন্যাসী সুসংহত রাষ্ট্রজীবন ও জাতীয় ঐক্যবিধানের লক্ষ্যে সকল শিষ্য ও ভক্তকে 'ওঁ অসতো মা সদ্গময়। তমসো মা জ্যোতির্গময়।।'— এই প্রার্থনায় সম্মিলিত হওয়ার নির্দেশ দান করে গিয়েছেন। ■

ফঃ ৪

বাঙ্গালির নববর্ষ

কল্যাণ গৌতম

বাঙ্গলায় নববর্ষ উদ্‌যাপনের দুটি ঘরানা। প্রথম, শরৎ-অন্তিম নববর্ষ; যেখানে কার্তিক বা অগ্রহায়ণ বছরের শুরু, নবান্ন তার ভিত্তি। দ্বিতীয়, বসন্ত-ভিত্তিক নববর্ষ; যেখানে কৃষক নব আনন্দে জেগে কৃষিকাজের উদ্যোগী হয়। প্রথমটি ফসলোত্তর নববর্ষ। দ্বিতীয়টিকে বলা যায় প্রাক-ফসলি নববর্ষ। পয়লা বৈশাখ উদ্‌যাপনের আগে অঘ্রাণ মাসে শুরু হত নববর্ষ। নবান্নের কথা স্মরণ রেখেই মার্গশীর্ষ মাস ছিল 'অগ্রহায়ণ'। 'অগ্র' শব্দের অর্থ 'সামনে' আর 'হায়ণ' কথাটির মানে 'বৎসর'। কাজেই বছরের গোড়ার মাস অঘ্রাণ। ফসলের ভরা মরাই নিয়ে চাষির নববর্ষের আনন্দে মেতে ওঠা। কার্তিকের অন্নাভাবের পর নবান্নের ফসলপ্রাপ্তি। আর তারই প্রেক্ষিতে নববর্ষের সূচনা। 'নবানে-নববর্ষ'-তে রয়েছে নানান লৌকিক আচার-সংস্কার, হিন্দু-বিশ্বাসের নানা আঙ্গিক, বিশেষত ধান্যলক্ষ্মীর পূজা।

ভারত ব্যাপী হিন্দু নববর্ষ

চৈত্র মাসের শুক্ল প্রতিপদ তিথিটিকে বছরের প্রথম দিন হিসেবে দেশজুড়ে পালন করার হিন্দু সনাতনী রীতি বহুদিনের। দিনটির নাম বর্ষ প্রতিপদা। চান্দ্র মাস অনুসারে বর্ষগণনার এক প্রাচীন পরম্পরা। যাতে শুক্লপক্ষের প্রতিপদ তিথি থেকে অমাবস্যা পর্যন্ত এক একটি মাস বিবেচিত হয়। দেশের নানা প্রান্তে এই দিনটি মহা সমারোহে পালিত হয়, গ্রহণ করা হয় প্রতীকী খাদ্য। দাক্ষিণাত্যে নিমফুল, গুড়, লঙ্কা, তেঁতুল, ও কাঁচা আম দিয়ে তৈরি হয় বর্ষবরণের খাবার, যার উপাদানগুলির স্বাদ আলাদা। ছয় রকমের স্বাদে ছয়টি পৃথক ভাবনা সম্পৃক্ত— তিক্ত নিম দুঃখের প্রতীক, মিষ্ট গুড় আনন্দের প্রতীক, লঙ্কার ঝাল ক্রোধ, লবণ ভয়, টক তেঁতুল বিরক্তি এবং কষা কাঁচা আম বিস্ময়ের প্রতীক। এক কথায় জীবনের নানান আবেগ এবং সুখ-দুঃখের নানান পরিস্থিতির এক রূপক-সাংকেতিক খাদ্য-ভাবনা।

আর্থিক বছর

বর্ষ প্রতিপদা, আর্থিক বছর এবং পয়লা বৈশাখ— কোথায় যেন একসূত্রে মিলে যায়! ইউরোপের নানান দেশে কয়েক শতাব্দী আগে মার্চই ছিল প্রথম মাস। পরবর্তীকালে ইংরেজি মাসগুলি স্থান পরিবর্তন করেছে। এই পরিবর্তন ক্রিস্টমাসের দিকে লক্ষ্য রেখে। খ্রিস্টীয় প্লাবনে জানুয়ারি হলো প্রথম মাস, কিন্তু তাই বলে মার্চ তার গৌরব হারালো না। পৃথিবীর নানা দেশে মার্চ-এপ্রিল বর্ষ-সন্ধিক্ষণ; আর্থিক লেন-দেন জমা করার পালা। ভারতেও সরকারি-বেসরকারি করণগুলিতে চলে সেই ধারা, তা ইংরেজি ক্যালেন্ডার-ভিত্তিক নয়।

বর্ষবরণ

বর্ষ ঘুরে যায়, ধরা ঘুরে আসে— কিন্তু হৃদয় কি ঘুরবে না? নববর্ষের কাছে তো মানুষের অসীম আশা! মানুষ উজ্জীবিত হতে চায়; বছর-সন্ধিক্ষণে মানুষ তার মনোবীণায় বাঁধতে চায় নতুন তার। কিন্তু নববর্ষ অতীতকে অপনোদন করে নয়! অতীত সুখ-দুঃখ, আনন্দ-বেদনার ধারাবাহিকতা নিয়েই

বর্ষবরণ! মধুসূদন যতই লিখুন— ‘ভূত-রূপ সিন্ধুজলে গড়ায়ে পড়িল বৎসর’; মন মানে না, কারণ অতীত দিনের ভুলের ফর্দ যে আমাদের কুঁরে কুঁরে খায়! এখনও যদি অতীতচারী না হই; নিজের, সমাজের, রাষ্ট্রের কৃতকর্মের অন্যায়গুলি সংশোধন না করি তবে আগামী নববর্ষগুলি আমাদের ক্ষমা করবে না। সমৃদ্ধ ভারত, কুশল-রাজ্য যদি নির্মাণ করতে হয় তবে অতীত-চারণ করতেই হবে। নববর্ষের আনন্দবার্তার মাঝে ফেলে আসা দিনগুলির ভুল স্বীকার করে নিজের মতদান করতে হবে। নববর্ষ তাই নির্বাচনের ত্রুটি অপনোদনের যথার্থ মরশুম হয়ে উঠতে পারে। পূর্বের আনন্দ-রসও যেন আমরা ঢেলে নিতে পারি নতুন পাত্রে— ‘কাল যে কুসুম পড়বে ঝরে/তাদের কাছে নিস গো ভরে/ওই বছরের শেষের মধু/এই বছরের মৌচাকেতে।’ এই বঙ্গে যতটুকু আলো এখনো আছে তা নিবে গিয়ে আঁধার হবার আগেই বাতিতে নতুন তেল ও উসকো কাঠি দিয়ে আলোকিত করার নাম বর্ষবরণ। বাঙ্গালির বর্ষপঞ্জিতে সনাতনী-সংস্কৃতির মেলবন্ধনের দিন নববর্ষ, হিন্দুমিলন মঞ্চ গড়ে ওঠার দিন।

হে নতুন দেখা দিক আরবার

সনাতন-বিরোধী এক জগদ্দল পাথর ৩৪ বছর পশ্চিমবঙ্গকে করেছিল ভারত-বিমুখ; ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির যে অচ্ছেদ্য অঙ্গ পশ্চিমবঙ্গ— ভুলে গিয়েছিল বাঙ্গালি। শুরু হয়েছিল, যখন বাঙ্গালি-সম্ভূত ‘ভারত-কেশরী’কে হত্যা করা হয়েছিল কাশ্মীরের বধ্যভূমে। পশ্চিমবঙ্গ, ত্রিপুরার বাঙ্গালি ভারতমুখী না হয়ে হয়েছিল রাশিয়া ও চীনের অভিমুখী। যে সমাজতন্ত্রের স্বপ্ন বাঙ্গালিকে দেখানো হয়েছিল তার চাইতে ঢের চিরায়ত-চেতনা ও অঙ্কুর ভারতবর্ষেই ছিল মজুত— শ্রীচৈতন্য, বঙ্কিমচন্দ্র, স্বামী বিবেকানন্দে সমাজ-দর্শন ও সাম্যবাদের ধারণা এক চিরায়ত সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল, ক্ষেত্রও ছিল প্রস্তুত। কিন্তু অতিপক্কদের মগজ ভারতে ছিল না কোনোদিন। ভল্গার জলে ধোলাই হয়ে গিয়েছিল তারা, তারপর হোয়াং-হো নদীতে ধুয়ে যায়। গঙ্গা পায় না। গবেষণা হওয়া দরকার কমিউনিস্ট পার্টি অব ইন্ডিয়া (বিবেকানন্দবাদী) দল কেন প্রতিষ্ঠা হলো না ভারতে, গবেষণা হওয়া দরকার, সাম্যবাদীদের ‘অফিসিয়াল’ ধর্ম কি হিন্দু-বিদ্বেষী কোনো কিছু? আত্মোপলব্ধিতে, সর্বভূতে দেবোপম সম্ভাবনাকে চিনে নেবার সুযোগ ভারতেই ছিল।

শ্রীচৈতন্য, স্বামী বিবেকানন্দকে বাদ দিয়ে ভারতবর্ষীয় সমাজতন্ত্রের ভাবনার গোড়াতে ভুল কেন? সমাজতান্ত্রিকরা বুঝতে অক্ষম হয়েছিল কি, ধর্মই ভারতবর্ষের আত্মা, মেরুদণ্ড, জীবনকাঠি? ভারতবর্ষে সনাতনী-সভ্যতা ধ্বংস করার জন্যই বিদেশি-তত্ত্ব খাড়া করা হয়েছিল এবং তাতে ছদ্মবেশী লিবারেল, হিন্দুবিদ্বেষীরা সঙ্গত করে। সাম্রাজ্য বিস্তার করার ব্লু-প্রিন্ট হাতে নেয়। আজ যখন কৃতকর্মে ওরা অপ্রাসঙ্গিক, অণুবীক্ষণযন্ত্র ছাড়া ওদের অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যায় না— ওইসব আগাছা অপনোদন করার যোগ্যতম নববর্ষ হচ্ছে ১৪৩১ বঙ্গাব্দ। ভারতবর্ষের সমাজ ও রাষ্ট্রজীবনকে ধর্ম থেকে পৃথক করা মানেই ভারত রাষ্ট্রকে মৃত্যুর দিকে ঠেলে দেওয়া। তা ওরাই করতো। সেই অন্তর্জলি যাত্রা শুরু হয় ৭০ বছর ধরে।

নববর্ষ-ভাবনা

বাংলা ক্যালেন্ডারে নববর্ষ হলো পয়লা বৈশাখ। বসন্তের শেষে গ্রীষ্মের আগমনেই আসে বৈশাখ। আর সেটা চৈত্রের চিতাভস্ম উড়িয়ে। নববর্ষে সব অর্থেই পরিবর্তন চাই। বিশ্বপ্রকৃতির পরিবর্তন, রূপবৈচিত্রের পরিবর্তন, চিন্তা-চেতনার পরিবর্তন, সেই সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গের রাজনৈতিক পরিবর্তন। ‘শুকনো গাঙ্গে আসুক জীবনের বন্যা’; ভেসে যাক জীর্ণ পুরাতন; বাঙ্গলার গ্রাম-জনপদ থেকে বারুদের ঘ্রাণ মুছে যাক। নেমে আসুক ১৪৩১ বঙ্গাব্দ। নরশ্রেষ্ঠ কালপুরুষের নববিধানে সারা ভারতের সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গের রাজনৈতিক আকাশ নীল নির্মল হোক। আসুক ‘নববর্ষের পুণ্য বাসরের কালবৈশাখী’। তার জন্য যে মূল্যই চোকাতে হোক না কেন— সে যুদ্ধ ‘হোক সে ভীষণ’, ভয় ভুলে উপভোগ্য হোক ‘অদ্ভুত উল্লাস’। কালবৈশাখে নেমে আসুক তার বিজয় রথ। তার পিনাকের টংকার ধ্বনি শুনতে পাচ্ছি। মানুষের ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে গেছে, তাই ‘ভাঙনের জয়গান’ গাই— ‘বাঁধ ভেঙে দাও বাঁধ ভেঙে দাও বাঁধ ভেঙে দাও...’ ■

With Best Compliments
from :

PAHARPUR COOLING TOWERS LTD.

PAHARPUR HOUSE

8/1/B, Diamond Harbour Road

Kolkata - 700 027, India

www.paharpur.com

CIN : U02005WB1949PLC018363

Ph. +91-33-4013 3000

Dir. +91-33-4013 3403

Fax : +91-33-4013 3499

vswarup@paharpur.com

গৌরী বন্দ্যোপাধ্যায়

ভারতীয় সংস্কৃতির প্রাণপুরুষ শ্রীরাম

শ্রীরামচন্দ্র নিজভূমে প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন। ৫০০ বছরের সমস্ত অবিচার ও প্রতিকূলতাকে অতিক্রম করে গত ২২ জানুয়ারি অভিজিৎ মূহূর্তের মাহেন্দ্রক্ষণে নিজ মন্দিরে রামলালার বিগ্রহের প্রাণপ্রতিষ্ঠা হয়েছে।

শ্রীরাম ছিলেন ন্যায়, ধর্ম ও বীরত্বের এক সম্মিলিত রূপ। তাঁর এই অধিষ্ঠান সত্য হোক, ভারত আবার জগৎসভায় নিজের শ্রেষ্ঠ আসনটি ফিরে পাক। শ্রীরাম যেমন ভারতের, তেমনই সমগ্র পূর্ব ও দক্ষিণ এশিয়ায় সাংস্কৃতিক প্রতীকরূপে শ্রদ্ধেয় ও পূজ্য।

শ্রীরামচন্দ্র ভারতীয় সংস্কৃতির অন্যতম প্রতিভূ। পিতৃসত্য রক্ষা করার জন্য তিনি হেলায় রাজ্যাভিষেক ত্যাগ করে চোদ্দ বছর বনবাসের এক অনিশ্চিত ও কষ্টকর জীবন স্বীকার করেছিলেন। অনুজদের সঙ্গে তিনি যেমন একাত্মা ছিলেন, তেমনই ছিলেন একজন অভিন্নহৃদয় স্বামী। রাজকর্তব্য সাধনে তিনি প্রাণাধিক প্রিয় স্ত্রীকে বনবাসে পাঠিয়েছিলেন এবং সেই সঙ্গে নিজেকেও সর্বপ্রকার রাজকীয় সুখ থেকে সরিয়ে, সংসারে থেকেও সন্ন্যাসীর জীবনযাপন করেছিলেন। সস্ত্রীক যজ্ঞ করার নিয়ম রক্ষা করতে তিনি স্বর্ণসীতা তৈরি করে যজ্ঞের কাজ সম্পন্ন করেছিলেন। আত্মীয়স্বজনদের অনুরোধ-উপরোধেও তিনি পুনর্বিবাহ করেননি। ত্রুটিহীন ভাবে তিনি রাজধর্ম পালন করেছিলেন। তাঁর এই চারিত্রিক গুণ শুধু ভারতে নয়, সমগ্র বিশ্বে তাঁকে অনন্য করে রেখেছে। ভারতবর্ষের বহু গ্রাম, শহর, বহু বসতি, নদী, পাহাড় যেমন রামের নামে চিহ্নিত রয়েছে, তেমনই রয়েছে মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলিতেও।

প্রাচীন ইরানীয় ধর্মগ্রন্থে শ্রীরাম শান্তি ও সুখের দেবতার নাম। রামের নাম যুক্ত হয়ে ইরানে রয়েছে রামহরমুজ, ইজরায়েলে রামঃ, ইরাকে রামাদি, প্যালেস্টাইনে রামলা; সৌদি আরবে রামলাট ইত্যাদি শহর ও অঞ্চল। জর্ডনে রামের নামাঙ্কিত পাহাড় রয়েছে রাম-জবল। বসতি রয়েছে রাম, রামাল্লা, রামথা ইত্যাদি। ইজরায়েলেও রয়েছে রাম, রামলা। পাকিস্তানে যেমন রামনগর আছে, তেমনই রয়েছে লব ও কুশের নামে চিহ্নিত দুটি শহর— লাহোর (লবপুর) ও কুশেরু (কুশপুর)। পাকিস্তান যাঁকে জাতীয় কবির মর্যাদা দিয়েছে সেই মহম্মদ ইকবাল তাঁর 'রাম' নামক কবিতায় লিখেছেন, রামের অস্তিত্ব হিন্দুস্থানের গৌরবের বিষয়। স্বচ্ছ দৃষ্টির লোকেরা রামকে হিন্দের ইমাম মনে করেন। তাঁর মার্গদর্শনের গৌরবে সমগ্র হিন্দুস্থান গৌরবান্বিত হয়ে আছে। তিনি বীর ছিলেন, ছিলেন পবিত্রতায় ও স্নেহ-প্রীতিতে অনন্য— 'অহলে নজর সমঝতে হ্যাঁয়

ইসকো ইমাম এ হিন্দ। ....তলবার কা ধনী থা, সুজাত মেঁ ফর্দ থা। পাকীজগী মেঁ, জোশ এ মহব্বত মেঁ ফর্দ থা।' সমগ্র পূর্ব ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় শ্রীরামকে নিয়ে তৈরি হয়েছে নানা কাব্য, মহাকাব্য।

ইন্দোনেশিয়ার ৯০ শতাংশ মানুষ ইসলামে ধর্মান্তরিত হওয়া সত্ত্বেও সেখানে বিভিন্ন রঙ্গালয়ে প্রতিদিন রামায়ণের নৃত্যাভিনয় হয়, পথের মোড়ে রামের ও রামায়ণের বিভিন্ন চরিত্রের মূর্তি শোভা পায়।

অযোধ্যায় রামমন্দির প্রতিষ্ঠার দিন সংযুক্ত আরব আমিরশাহির সর্বোচ্চ সৌধ বুর্জ খালিফায় শ্রীরামের সুবিশাল আলোক-মূর্তি প্রতিফলিত করা হয়। সেই দেশের রাজধানী আবুধাবিতে সরকারের পক্ষ থেকে দেওয়া সাড়ে পাঁচ হেক্টর জমির ওপরে একজন খ্রিস্টান স্থপতির তত্ত্বাবধানে অক্ষর পুরুষোত্তমের শ্রীরামের বিশাল মন্দির তৈরি হয়েছে যার উদ্বোধন হয়েছে গত ১৪ ফেব্রুয়ারি অর্থাৎ অযোধ্যার রাম মন্দিরের উদ্বোধনের ২৩ দিন পরে। ভারতে রাজনৈতিক বিরোধীরা অযোধ্যায় রামমনিন্দরের উদ্বোধনকে অসম্পূর্ণ মন্দিরের উদ্বোধন বলছে যা সর্বৈব ভুল। সেখানে রামলালার মন্দির তৈরি সম্পূর্ণ হয়েছে। যা এখনও বাকি আছে তা হলো সেই মন্দির চত্বরেই পাঁচটি মণ্ডপ-সহ আরও ১৩টি মন্দিরের নির্মাণের কাজ। সেই সব মন্দির হবে অহল্যা, অগস্ত্য, বাল্মীকি, শবরী, নিষাদরাজ গুহক-সহ বেশ কয়েকটি। সেখানে তৈরি হবে এক অন্নসত্রও। শ্রীরামের জন্মস্থানে কেউ যাতে অভুক্ত না থাকে তার ব্যবস্থাও করা হবে।

অযোধ্যার রামমন্দিরের স্থাপনের সঙ্গে তৈরি হচ্ছে এক রামায়ণ সার্কিট যার সঙ্গে যুক্ত হবে ভারত ও নেপালের সীমান্তের শহর জনকপুরও। রামমন্দিরের উদ্বোধনের দিন জনকপুর সওয়া লক্ষ প্রদীপের আলোয় আলোকিত হয়ে উঠেছিল। সেখান থেকে ৫০০ জনের প্রতিনিধি দল রামলালার জন্য ৬০০০ উপঢৌকনের সামগ্রী নিয়ে অযোধ্যায় এসেছিলেন। এছাড়াও সুদূর কোরিয়া থেকে এসেছিলেন শ্রীযুক্ত চিলসু, সেখানকার 'কারক' রাজবংশের প্রতিনিধি স্বরূপ। ৪৮ খ্রিস্টাব্দে অযোধ্যার রাজকুমারী হিয়া বিবাহসূত্রে বর্তমান কোরিয়ায় গিয়েছিলেন। সেই রাজপরিবারের অধস্তন মানুষের সংখ্যা এখন প্রায় ৩৫ লক্ষ এবং তাঁরা নিজেদের অযোধ্যার সঙ্গে যুক্ত বলে আজও গৌরব বোধ করেন। ভারতীয় সংস্কৃতির প্রাণপুরুষ শ্রীরামের সঙ্গে সবার এই একাত্মতার প্রতিফলন সত্যই অত্যন্ত আনন্দ ও গৌরবের বিষয়। ভারতের নানা প্রান্তের বহু অন্য ধর্মের মানুষের সঙ্গে এই কলকাতারও অনেকে নানা কাজের মাধ্যমে অযোধ্যার মন্দিরের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত হয়েছিলেন। কেউ স্বচ্ছতা অনুষ্ঠানে অংশ নিয়েছিলেন, কেউ আবার বড়ো এলইডি পর্দায় পল্লীবাসীদের ভালো করে অনুষ্ঠানটি দেখাবার ব্যবস্থা করেছিলেন। কেউ আবার নিজ এলাকায় শ্রীরামচন্দ্রের মূর্তি প্রতিষ্ঠিত করার কাজে সর্বাত্মক ভাবে যুক্ত হয়েছিলেন।

আজ থেকে প্রায় পাঁচশো বছর আগে শ্রীরামকে তাঁর জন্মস্থান থেকে উৎখাত করা হয়েছিল। তখন ছিল মুঘল শাসন। মুঘলদের পরে এল ব্রিটিশরা। তারপরে দেশ স্বাধীন হওয়ারও ৭৫ বছর পরে শ্রীরামচন্দ্রকে তাঁর জন্মস্থানে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করা সম্ভব হলো শুধুমাত্র কয়েকজন করিৎকর্মা প্রধানমন্ত্রীর প্রচেষ্টায়। গুরু নানকদেব ১৫১১ সালে অযোধ্যায় শ্রীরামের যে ভব্য মন্দির দর্শন করেছিলেন তার বিবরণ লেখা আছে জন্মশাখী নামক শিখ ধর্মগ্রন্থে। সেই সাক্ষ্য ও বাবরের সেনাপতির তৈরি করা মসজিদের মাটির নীচে ভগ্ন মন্দিরের উপস্থিতির সাক্ষ্যকে হাতিয়ার করেই ভারত আবার শ্রীরামচন্দ্রকে নিজক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত করতে পেরেছে। ভারতীয় সংস্কৃতির প্রাণপুরুষকে এভাবে সগৌরবে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করার মধ্য দিয়ে সমগ্র বিশ্বে ন্যায়ধর্মের জয়ের ভিত্তিও স্থাপিত হলো।

মৃত্যুশয্যায় শায়িত রাবণের জ্ঞান ও বুদ্ধিকে শ্রদ্ধা জানিয়ে শ্রীরামচন্দ্র অনুজ লক্ষ্মণের মাধ্যমে যে সকল পাঠ তাঁর কাছ থেকে গ্রহণ করেছিলেন তার একটি ছিল 'শুভস্য শীঘ্রম, অশুভস্য কালহরণম্'-এর উপদেশ। যার অর্থ হলো শুভকাজে কালক্ষেপ না করে শীঘ্রতা করা উচিত এবং অশুভ কাজে কালহরণ করাই বুদ্ধিমানের কাজ। হিন্দি এক দোহাতেও বলা হয়েছে সেই একই কথা— 'কল করে সো আজ করো, আজ করে সো অব। পল মেঁ পরলয় হোয়েগা, বহুরি করোগা কব।।' যার অর্থ কালকের কাজ আজই করে নাও আর আজকের কাজ এখনই করো। পলকে প্রলয় ঘটে যাবে, তখন আর কবে করবে? রামমন্দির তৈরি ও সেই মন্দিরে রামলালাকে প্রতিষ্ঠিত করার কাজে ব্যগ্রতা সেই সব প্রবচনকে স্মরণে রেখেই হয়েছে। পলকে প্রলয় ঘটাবার জন্য বিরোধীরা উন্মুখ হয়ে আছে। তাই শুভস্য শীঘ্রম্ মেনে মূল মন্দির তৈরি হতেই কালক্ষেপ না করে, অন্যান্য মন্দির ও মণ্ডপের নির্মাণের জন্য অপেক্ষা না করে রামলালার প্রাণপ্রতিষ্ঠার এই সিদ্ধান্ত ছিল সর্বতোভাবে সঠিক। শুভকাজে বিরোধীপক্ষের বিরোধিতাকে গ্রাহ্য না করাই বুদ্ধিমানের কাজ।

অযোধ্যায় রামলালা বিরাজমান হয়েছেন। বহু শতাব্দী ধরে চলা এক সংগ্রাম থেকে ভারতবাসী মুক্তি পেয়েছে। এই ঘটনাকে ভারত নবযুগের সূচনা বলে মনে করছে। মনে হয় এখন 'জয় শ্রীরাম'-এর রণহুংকারের আর প্রয়োজন নেই। অনেকেই এখন আর 'জয় শ্রীরাম' না বলে 'রাম রাম' বলে অন্যদের অভিবাদন করছেন। শ্রীরামের নাম আমাদের দেশে নানাভাবে উচ্চারিত হয়। কেউ নিন্দনীয় কাজ করলে বাংলা ভাষায় 'রাম রাম' বলে তাকে ভর্ৎসনা করা হয়। হিন্দিতে 'রাম রাম হো জানা'র অর্থ মারা যাওয়া। তাই সর্ব ভাষার উপযোগী এক শ্রুতিমধুর সম্ভাষণ এখন আমাদের প্রয়োজন। উত্তর ভারতের চিরকালীন সম্ভাষণ 'জয় রামজী কী' রয়েছে। বাংলায় 'রাম রাম' না বলে 'হরে রাম, হরে কৃষ্ণ বা 'জয় রাম' বলা যেতে পারে।

(শ্রীরামনবমী উপলক্ষ্যে প্রকাশিত)

কেমন ছিল রামায়ণের সময়ে অযোধ্যা

ড. অনিল কুমার ঘোষ

সাম্প্রতিক সময়ে দেশ বিদেশের খবরের শিরোনামে ভারতবর্ষের অযোধ্যা। কারণ গত ২২ জানুয়ারি অযোধ্যা নগরীর শ্রীরামজন্মভূমিতে রামমন্দিরের পুনঃস্থাপন এবং রামলালার প্রাণপ্রতিষ্ঠা সম্পন্ন হয়েছে। হিন্দুদের প্রায় ৫০০ বছরের লড়াই সংগ্রামের অবসান ঘটেছে এই অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে। তারই উচ্ছ্বাস, আনন্দ ধরা পড়েছে বিশ্বের সর্বত্র। এইরকম একটি সময়ে জানতে ইচ্ছে করে, কেমন ছিল অযোধ্যা নগরী সেই রামায়ণের সময় কালে।বাল্মীকি রামায়ণের বালকাণ্ডে ৫ ও ৬ সর্গে রাজা দশরথের রাজত্বকালে বা বালক রামের সময়ে অযোধ্যা নগরীর সম্পর্কে বলা হয়েছে— 'কোসলো নাম মুদিতঃ স্ফীতো জনপদো মহান্। নিবিষ্টঃ সরযূতীরে প্রভুত ধন ধান্যবান্'।।(১.৫.৫)।এই রাজ্যে বসবাসকারী মানুষজন যে সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যে জীবনযাপন করত সেকথাও রামায়ণে উল্লেখিত আছে। সমভূমিতে যারা বসবাস করত তাদের বাড়িগুলি ঘনিষ্ঠভাবে ছিল। শালি ধানের সরু চাল এবং ইক্ষু সদৃশ মিষ্টি জল ছিল প্রত্যেকের বাড়িতে— 'গৃহগাঢ়ামবিচ্ছিদ্রাং সমভূমৌ নিবেশিতাম্। শালি তণ্ডুল সম্পূর্ণামিক্ষু কাণ্ডরসোদকাম্'।। (১.৫.১৭)। এই নগরী রাজধানী হিসেবে তৈরি করেছিলেন বিবস্বান পুত্র বৈবস্বত মনু স্বয়ং— 'অযোধ্যা নাম নগরী তত্রাসিল্লোক বিশ্রুতা। মনুনা মানবেন্দ্রেণ যা পুরী নির্মিতা স্বয়ম্'।।(১.৫.৬)।

আয়তন ও সুরক্ষা

সে সময় অযোধ্যার আয়তন, বিস্তৃতি, সুরক্ষাবলয় কেমন ছিল, সেই প্রসঙ্গেও বাল্মীকি রামায়ণে উল্লেখ পাওয়া যায়— 'আয়তা দশ চ দ্বে চ যোজনানী মহাপুরী। শ্রীমতী ত্রীণি বিস্তীর্ণা সুবিভক্ত মহাপথা'।।(১.৫.৭)।।অর্থাৎ অযোধ্যা নগরী তখন দৈর্ঘ্যে ১২ যোজন এবং প্রস্থে ৩ যোজন (১ যোজন = ৪ ক্রোশ বা ৮ মাইল প্রায়) অর্থাৎ কোসল রাজ্যের রাজধানী অযোধ্যা বিস্তৃত ছিল ২৩০৪ বর্গমাইল এলাকা জুড়ে। সেই সঙ্গে ছিল বিস্তীর্ণ মহাপথ। সেই রাজপথের ধারে ছিল প্রস্ফুটিত পুষ্পকানন, যেখানে নিয়মিত জল সিঞ্চন করা হতো। সুপরিচ্ছন্ন ও সুরক্ষিত সুব্যবস্থাপনের মধ্যে রাজা দশরথ রাজত্ব করতেন ঠিক যেমন স্বর্গরাজ্যে দেবরাজ ইন্দ্র ছিলেন। অযোধ্যা নগরটি দুর্গ দিয়ে ঘেরা এবং গভীর খাতযুক্ত পরিখাবেষ্টিত ছিল, যা অন্যদের প্রবেশে দুর্গম ছিল। ফলে কোনো শত্রু প্রবেশ করে নগরকে দখল নিতে পারত না। প্রচুর হাতি ঘোড়া, গবাদি পশু, উঠ ও খচ্চরে পূর্ণ ছিল।

যাকে যুদ্ধ করে জয় করা যায় না, তাই হলো অযোধ্যা। শহরটিতে প্রচুর সৈন্য বা যোদ্ধা ছিল, ঠিক যেন সিংহ সমন্বিত গুহা। শহরটিতে মহারথ নামে পরিচিত হাজার হাজার যোদ্ধা, দক্ষ তিরন্দাজ ছিল, ক্ষীপ্রগতিসম্পন্ন যোদ্ধারা বাণ দিয়ে বিদ্ধ না করে তারা শব্দের মাধ্যমে আগন্তুক শত্রুদের চিহ্নিত করে দিত। তিরন্দাজদের ধারালো তির বা তাদের শক্তি দিয়ে তারা গর্জনকারী বাঘ, সিংহ প্রভৃতি শ্বাপদ জন্তুদের বনের মধ্যেই রুখে দিত। জ্বলন্ত বহ্নিশিখা সম, দক্ষদের মধ্যে সবচেয়ে স্থির দৃঢ় ও অস্ত্রশিক্ষায় সম্পূর্ণ ছিল এই সেনারা। নগরের সুরক্ষার জন্য সুদক্ষ ঘোড়াগুলি কম্বোজ, বাহ্লিক, বনায়ু ও সিন্ধুদেশ থেকে আনা হয়েছিল।

নগরের বৈভব ও ব্যাস্ততা

এই যে নগর অযোধ্যা, তার মধ্যে রাজপ্রাসাদ ইত্যাদি সবকিছুর মধ্যে ছিল কর্মব্যস্ততা ও বৈভবের সমাবেশ। নগরের প্রবেশদ্বারে ছিল খিলান, সুশৃঙ্খল ব্যবস্থিত স্থানীয় বাজার ছিল এবং দুর্গে ছিল সকল প্রকার যন্ত্রপাতি ও অস্ত্রশস্ত্র। অতুলনীয় সৌন্দর্যমণ্ডিত এই নগরীতে প্রচুর পরিমাণে মানুষজন ছিল যারা শ্রদ্ধাভরে রাজার গুণগান করত এবং রাজ ভবনটিকে পতাকা দ্বারা সজ্জিত এবং শতশত শতাঘ্নী (আজকের দিনের ক্ষেপণাস্ত্র সম) দ্বারা সুরক্ষা দিত। শহরটিতে ধ্বনিতে হতো দুন্দভি, মৃদঙ্গ, বীণা, ড্রামের মতো 'পণব' নামে একপ্রকার বাদ্য যন্ত্রের সুরেলা ধ্বনিতে। নগরটি কর প্রদানকারী সামন্ত রাজাদের আতিথেয়তায় সর্বদায় ব্যস্তমুখর ছিল, বণিকেরা আসত বিভিন্ন দেশ থেকে— 'সামন্তরাজসংঘৈশ্চ বলিকর্মভিরাবৃতাম্। নানাদেশনিবাসৈশ্চ বণিগ্‌ভিরুপশোভিতাম্।।(১-৫-১৪)। নগরের চারদিকে ছিল শহরতলী অঞ্চল যেখানে বহু নট-নটী থাকত। আর ছিল সুগন্ধী পুষ্পের বাগিচা ও আমবাগান, সবশেষে ছিল সারি সারি শালগাছ যা প্রাকারসম কার্যকর ছিল— 'বধূনাটক সংঘৈশ্চ সংযুক্তাং সর্বতঃ পুরীম। উদ্যানাম্রবনোপেতাং মহতীং সালমেখলাম্।।(১.৫.১২)। সবকিছু মিলিয়ে সদাচঞ্চল ও ব্যস্তমুখর অথচ সুরক্ষিত ছিল দশরথের রাজত্বে অযোধ্যা নগরী।

জনজীবনে আধ্যাত্মিক ও নৈতিকতা

এই উৎকৃষ্ট নগরের লোকেরা সকলে সুখী, ধার্মিক, বেদ ও অন্যান্য শাস্ত্রে সুপণ্ডিত, নিজ সম্পদের অধিকারে সন্তুষ্ট, নির্লোভ জীবনচর্যায় তারা ছিল সত্যবাদী— 'তস্মিন্ পুরবরে হৃষ্টা ধর্মাত্মনো বহুশ্রুতাঃ। নরাস্তুষ্টা ধনৈঃ স্বৈঃ স্বৈঃ অলুব্ধাঃ সত্যবাদিনঃ'।। (১.৬.৬)। শহরের সকল পুরুষ ও মহিলা আচার আচরণে সংযতেন্দ্রিয় ও ন্যায়পরায়ণ ছিল। তাদের স্বনিয়ন্ত্রিত জীবনযাপন মহর্ষিদের মতোই খাঁটি ও পবিত্র ছিল— সর্বে নরাশ্চ নার্যশ্চ ধর্মশীলাঃ সুসংযতাঃ। মুদিতা শীলবৃত্তাভ্যাস মহর্ষয়ঃ ইব অমলাঃ'।। ১.৬.৯।। তাই নয়, সে সময় অযোধ্যায় কোনো নাস্তিক, মিথ্যাবাদী এবং শাস্ত্রে অনভিজ্ঞ কেউ ছিল না। নগরে এসময় এমন কেউ ছিল না, যে অন্যের প্রতি ঈর্ষাপরায়ণ, অশক্ত বা বিদ্যা লাভে অক্ষম। এমন কোনো গৃহস্থ ছিল না যে ধর্ম, অর্থ, কাম অর্জন করতে অক্ষম। সুশাসনে জনসাধারণের মধ্যে নৈতিক, আধ্যাত্মিক জীবনবোধ জাগ্রত হয়েছিল।

বহু বছর রাজ্য শাসন করার পর শ্রীরামের মর্ত্যধাম ত্যাগ করার পরে পরেই, কথিত যে আযোধ্যা জনশূন্য হয়ে পড়ে। তারপর এক সময় সাকেত নামে বাণিজ্য নগরী হিসেবে উত্তরাপথ ও দক্ষিণাপথের সংযোগস্থলে প্রসিদ্ধি লাভ করে। পুনরায় গুপ্ত যুগে নগরীটি সাকেত থেকে অযোধ্যা নামে ফিরে আসে। ২০২৪ থেকে নতুন এক রূপে ব্যস্তমুখর নগরীতে পরিণত হচ্ছে রামলালার প্রাণপ্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে।

With Best Compliments
From -

UMESH
GANERIWALA

With Best Compliments
From -

A
Well wisher

With Best Compliments From :

EPC Electrical Private Limited.

71A, Tollygunge Road, Kolkata - 700 033

Phone :- 24241240/ 7108, M: - 9748571413
E-mail : epc@epcfans.com
Website : www.epcfan.in

Manufacturer of

Heavy Duty Exhaust Fans, Air Circulator, Mancooler,
Axial Flow Fan, Motor

WE HAVE DEALERS ALL OVER INDIA

হিন্দু স্পর্ধার আলোকবর্তিকা

পূর্ব ভারতের অগ্নিকুলগৌরব রায়শ্রেষ্ঠ মহারাজাধিরাজ

তিলক সেনগুপ্ত

‘যশোর-নগর ধাম, প্রতাপাদিত্য নাম
মহারাজা বঙ্গজ কায়স্থ।
নাহি মানে পাতশায়, কেহ নাহি আঁটে তায়,
ভয়ে যত ভূপতি দ্বারস্থ
বরপুত্র ভবানীর, প্রিয়তম পৃথিবীর
বায়ান্ন হাজার যার ঢালী।
যোড়শ হলকা হাতি, অযুত তুরঙ্গ সাতি,
যুদ্ধকালে সেনাপতি কালী।’

—রায়গুণাকর ভারতচন্দ্র

মুঘল আগ্রাসনের বিরুদ্ধে সম্মুখ সমরে অবতীর্ণ হয়ে সমগ্র বৃহৎবঙ্গে শাসন বিস্তার করে তিনি নির্মাণ করেন অখণ্ড সনাতনী যশোর রাজ্য। তিনি কে? অগ্নিকুলগৌরব রায়শ্রেষ্ঠ মহারাজাধিরাজ প্রতাপাদিত্য।

যোড়শ শতকের বঙ্গদেশের যশোহর রাজ্যের নৃপতি, যিনি সর্বপ্রথম এক স্বাধীন সাম্রাজ্যের রাজা হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে মুঘল শাসনাধীন ভারতে প্রথম স্বাধীন ‘স্বরাজ’-এর আদর্শ স্থাপন করেন। সমগ্র পূর্ব ভারত থেকে মুঘলদের উৎখাত করে এবং সদর্পে বাঙ্গলার স্বাধীনতা ঘোষণা করে তিনি বাঙ্গালি জাতির শৌর্যের অতীত গরিমাকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। মহারাজ প্রতাপাদিত্য মুঘলদের মোট ৮টি যুদ্ধে পরাজিত করে বিহারের পাটনা পর্যন্ত জয় করেন এবং সমগ্র পূর্ব ভারতে স্বাধীন শাসন প্রতিষ্ঠা করেন।

১৫৬১ খ্রিস্টাব্দে (বঙ্গাব্দ ৯৬৮) কাশ্যপ গোত্রীয় বঙ্গজ ক্ষত্রিয় কায়স্থ গুহরায় রাজবংশের যশোরনৃপতি রাজা শ্রীহরি বিক্রমাদিত্যের প্রাসাদে মা ভবানীর পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করেন প্রতাপাদিত্য। জন্মের পঞ্চম দিনেই সূতিকাগৃহে তাঁর মা প্রয়াত হন। কাকা বসন্তনারায়ণ রায়ের স্ত্রী অভয়াদেবী তাঁকে পুত্ররূপে মানুষ করেন। ছোটোবেলায় অভয়াদেবীর কাছেই প্রতাপ রামায়ণ, মহাভারত, শ্রীশ্রীচণ্ডী ইত্যাদি ধর্মগ্রন্থ অধ্যয়ন করেন। পাশাপাশি শুরু হলো বিদ্যা চর্চা। সংস্কৃত, বাংলা ও ফারসির মতো একাধিক ভাষা অধ্যয়ন করলেন।

কাকা বসন্ত রায়ের কাছে তিনি শাস্ত্রচর্চা ও শাস্ত্রবিদ্যা অধ্যয়ন করেন। ছোটোবেলা থেকেই কাকিমা অভয়াদেবীর কাছেই শুনেছেন, শশাঙ্ক, ধর্মপাল, দেবপাল, লক্ষ্মণসেন প্রমুখ স্বজাতীয় মহান সম্রাটদের বিজয় কীর্তি। আর সেই থেকেই তাঁর মনে স্বাদেশিকতার উন্মেষ ঘটে। বিধর্মী আক্রমণকারীদের বিরুদ্ধে দেশীয় রাজন্যদের ২০০ বছর ধরে চলে আসা হিন্দু প্রতিরোধের ইতিহাস তাঁর মননে এক স্বাধীন হিন্দু সাম্রাজ্য নির্মাণের বীজ বপন করে। প্রতাপাদিত্যের ঐকান্তিক ইচ্ছায় পরবর্তীকালে যশোর রাজ্যের রাজমাতারূপে অভয়াদেবী সম্মানিত হন। বড়ো হবার পাশাপাশি শুরু হলো অস্ত্রবিদ্যা। বর্শা, তরবারি, ধনুর্বাণ চালনায় দক্ষ হয়ে উঠলেন। সেই সময়ে বন্দুক পরিচালনায় তিনি অপ্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে ওঠেন। বন্ধুবান্ধব-সহ সুন্দরবনের গভীর জঙ্গলে প্রায়শই বাঘ, হরিণ, গণ্ডার প্রভৃতি জন্তু শিকার করতেন। সেই সময় প্রতাপের পরিচয় হয় দ্বারহট্টের সাহসী ব্রাহ্মণ যুবক শঙ্কর চক্রবর্তীর সঙ্গে। ক্রমশ তাঁরা পরমমিত্র হয়ে ওঠেন ও সর্দার শঙ্কর চক্রবর্তী যশোর রাজ্যের সেনাপতি এবং কূটনৈতিক প্রধানরূপে নিয়োজিত হন।

১৫৮২ খ্রিস্টাব্দে (৯৮৯ বঙ্গাব্দে) বৈশাখী পূর্ণিমা তিথিতে যশোর রাজধানী ধূমঘাটে সভাপণ্ডিত ও গুরু শ্রীকৃষ্ণ তর্কপঞ্চাননের মধ্যস্থতায় যথাশাস্ত্র বিধিতে প্রতাপাদিত্যের রাজ্যাভিষেক ক্রিয়া সম্পন্ন হয়। রাজ্যাভিষেক অনুষ্ঠানটি ছিল একটি জমকালো এবং বিস্তৃত ব্যাপার, যেখানে সেই সময়ের ঐতিহ্যবাহী রীতিনীতি ও আচার-অনুষ্ঠানের প্রতিফলন ঘটে।

অভিষেকের পর প্রতাপাদিত্য ‘মহারাজাধিরাজ’ উপাধি গ্রহণ করেন। এই ঘোষণা তাকে শুধু যশোরের সার্বভৌম শাসক হিসেবেই নয়, বৃহত্তর ভারতীয় রাজনৈতিক পটভূমিতেও একজন প্রভাবশালী ব্যক্তিত্ব হিসেবে স্থান দেয়। এরপরেই তিনি ধুম্রঘট্ট বা ধূমঘাটে রাজধানী স্থাপন করে যশোর রাজ্যের অধিষ্ঠাত্রী দেবী যশোরেশ্বরী মন্দির সংস্কার তথা পুনর্নির্মাণ করেন।

প্রতাপাদিত্যের রাজত্বে আইন-শৃঙ্খলা রূপায়ণ একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা। তিনি তার রাজ্যে শান্তি ও স্থিতিশীলতা বজায় রাখার দিকে মনোনিবেশ করেছিলেন। নিশ্চিত করেছিলেন যে তার প্রজারা বাইরের হুমকি বা অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্বের ভয় ছাড়াই বাঁচতে পারে।

যশোরের রাজসিংহাসনে অধিষ্ঠান করেই মহারাজ প্রতাপাদিত্য সাম্রাজ্য বিস্তারে মনোনিবেশ করেন, যার ফলে মুঘল বাদশাহের সঙ্গে তাঁর সংঘাত ছিল অবশ্যম্ভাবী। তাই ভবিষ্যৎ যুদ্ধসমূহের পরিকল্পনা করেই তিনি শৃঙ্খলাপরায়ণ প্রশিক্ষণে জোর দিয়ে ও উন্নত প্রযুক্তির অস্ত্রশস্ত্র বিনিয়োগ

ফঃ ৫

করে যশোর সেনাবাহিনীর প্রভূত সংস্কার করেন। প্রধানত যে সকল কারণে তিনি যুদ্ধের প্রস্তুতি নিয়েছিলেন, তা হলো— আত্মরক্ষা ও আত্মপ্রধান্য স্থাপন করা। বঙ্গদেশে হিন্দু শক্তির পুনঃপ্রতিষ্ঠা। মুঘল, মগ ও ফিরিঙ্গি দস্যুদের পাশবিক নির্যাতন থেকে তার রাজ্যের মানুষকে রক্ষা করা।

মহারাজ প্রতাপাদিত্য উন্নত সেনাবাহিনী গঠনের জন্য বাহিনীকে ন'টি ভাগে ভাগ করেন। প্রধান সেনাপতির অধীনে প্রত্যেক বিভাগে পৃথক পৃথক সেনানী ছিল। সেনাবাহিনীতে পদাতিক, অশ্বারোহী সৈন্য, তিরন্দাজ, গুপ্ত সৈন্য, রক্ষী সৈন্য, হস্তী সৈন্য, পার্বত্য সৈন্য, গোলন্দাজ সৈন্য, নৌ সৈন্য— এই নয় বিভাগে বিভক্ত ছিল। যুদ্ধে ঢাল, তলোয়ার, সড়কি, বল্লম, লেজা, কামান, বন্দুক, বর্শা, তির প্রভৃতি অস্ত্রশস্ত্র ব্যবহৃত হতো। সে সময়ে তাঁহার বাহান্ন হাজার ঢালি, একান্ন হাজার তিরন্দাজ, বহুসংখ্যক অশ্বারোহী, বহুযূথ হস্তী, অসংখ্য মুদ্গরধারী সৈন্য ছিল। অশ্বারোহী বাহিনীতে ১০ হাজার সৈন্য ছিল, যাদের সেনাপতি ছিলেন প্রতাপসিংহ দত্ত। যশোর সেনাতে মোট ৫১ হাজার তিরন্দাজ যোদ্ধা ছিল, তিরন্দাজদের যুদ্ধের জন্য প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছিল।

প্রতাপাদিত্যের সেনাবাহিনীতে কর্মী বৈচিত্র্য উল্লেখযোগ্য। বাঙ্গালি কায়স্থ, পর্তুগিজ নাবিক এবং কুকি ও আরাকানি সৈন্য-সহ বিভিন্ন সম্প্রদায়ের সমন্বয়ে সেনাবাহিনী গঠিত হয়েছিল। তিনি মুঘলদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে পর্তুগিজ অফিসারদেরও নিয়োগ করেছিলেন। প্রতাপাদিত্য তার রাজ্যের উপকূলীয় অবস্থান এবং পর্তুগিজ ও আরাকানি জলদস্যুদের ঘন ঘন অভিযানের কারণে একটি শক্তিশালী নৌবহর তৈরি করেছিলেন। যুদ্ধজাহাজে সুসজ্জিত একটি নৌবাহিনী ছিল। তিনি সুখা নামের একজন ব্যক্তির অধীনে গুপ্তচরদের একটি বাহিনী তৈরি করেছিলেন, যা গোয়েন্দা তথ্য এবং কৌশলগত তথ্য সংগ্রহের জন্য অপরিহার্য ছিল।

মহারাজ প্রতাপাদিত্যের প্রধান সেনাপতি ছিলেন দুজন ব্রাহ্মণ— সর্দার শঙ্কর চক্রবর্তী ও রুদ্রাদিত্য ভট্টাচার্য। নৌবাহিনীর প্রধান ছিলেন সেনাপতি সূর্যকান্ত গুহরায় ও অগাস্টাস পেড্রো। পদাতিক বাহিনীর প্রধান ছিলেন কালীদাস ঢালি ও মদনমোহন মল্ল। গোলন্দাজ বাহিনীর অধ্যক্ষ ছিলেন পর্তুগিজ ফ্রান্সিসকো রডা। রক্ষী বাহিনীর প্রধান ছিলেন রত্নেশ্বর রায়, যজ্ঞেশ্বর রায়, বিজয়রাম ভক্তচৌধুরী প্রমুখ। হস্তী সৈন্য বাহিনীর অধ্যক্ষ ছিলেন জামাল খান লোহানি।

১৫৮৭ সালে প্রতাপাদিত্য ঈশ্বরীপুরের কাছে তার নতুন রাজধানী প্রতিষ্ঠা করেন। যশোরের আরাধ্য দেবী যশোরেশ্বরী দেবীর মন্দিরের পুনঃপ্রতিষ্ঠা করলেন। সেখানেই তিনি ইমঘাট দুর্গ ও রাজপ্রাসাদ নির্মাণ করেন। বসন্তরায়ের উদ্যোগে মহাসমারোহে নতুন রাজধানীতে তাঁকে স্বাগত জানানো হয়। সেই সময় বারো ভুঁইয়াদের অনেকে যশোরে এসেছিলেন এবং প্রতাপাদিত্যের কাছে বঙ্গের স্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ রাখার জন্য একত্রে কাজ করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন।

হিজলির যুদ্ধের দ্বারা প্রত্যাপাদিত্য ওড়িশা বিজয় করেন। পুনরুদ্ধার করেন পুরীর জগন্নাথ মন্দির। ১৫৬৮ খ্রিস্টাব্দে আফগানরা ওড়িশা দখল করে। পুরী অঞ্চলে তাদের ডেরা বানায়। আফগান সালতানাত-এ-ওড়িশাহ প্রতিষ্ঠা করে। এই আফগান শাসনে ওড়িশাবাসীদের শোচনীয় অবস্থা হয়েছিল। তার আগেই পাঠানদের দ্বারা পুরী জগন্নাথ রথযাত্রার ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়। এই অবস্থায় পুরী মন্দিরের এক ব্যক্তি বিজয়রাম ভঞ্জ বাঙ্গলার স্বাধীন হিন্দুরাজ্য যশোরে আসেন এবং মহারাজের কাছে জগন্নাথ মন্দিরের দুর্দশার কথা সবিস্তারে বর্ণনা করেন। প্রতিবেশী রাজ্যের হিন্দুদের ওপর এই অত্যাচারের খবর শুনে মহারাজা প্রতাপাদিত্য ক্রুদ্ধ হন এবং শ্রীক্ষেত্র জগন্নাথ মন্দির পুনরুদ্ধারের জন্য তিনি ওড়িশা অভিযানের সিদ্ধান্ত নেন। আষাঢ়ের শুরুতেই ওড়িশা অভিযানের জন্য নৌবাহিনী সঞ্চালন শুরু করেন, নৌসেনাপতি সূর্যকান্ত গুহরায় ও মদনমোহন মল্ল মিলে নৌবাহিনী সজ্জিত করে ওড়িশার দিকে অগ্রসর হতে থাকেন। এসময় ওড়িশায় শাসন করত ঈশা খান, যে হিন্দুদের ওপর চরম অত্যাচার করত। যশোরের রাজার অভিযানের খবর শুনে ঈশা খান ওড়িশার উত্তর সীমান্তে হিজলি বন্দরে সেনা সাজিয়ে রাখে। আষাঢ়ের এক বৃষ্টিমুখর দিনে হিজলিতে ঈশা খানের সঙ্গে প্রতাপাদিত্যের চরম যুদ্ধ হয়। সুবর্ণরেখা নদীর পশ্চিম তীরে পাঠান সেনার সঙ্গে যশোর সেনার এক বিধ্বংসী যুদ্ধ হয়। মহারাজ প্রতাপাদিত্য ঈশা খানকে শোচনীয়ভাবে পরাস্ত করেন। ঈশা খান যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণত্যাগ করে। বিজয়ী প্রতাপাদিত্য পুরীক্ষেত্রে প্রবেশ করেন এবং দীর্ঘ ১৪ বছরের অচলাবস্থার পর পুনরায় জগন্নাথ মন্দিরের দ্বারোদঘাটন ও নিত্যপূজার্চনার সূচনা করেন। পুরীতে মহারাজ প্রতাপাদিত্যের প্রত্যক্ষ শাসন স্থাপিত হয় এবং ওড়িশা যশোর রাজ্যের অধীনে একটি সামন্তরাজ্যে পরিণত হয়। ওড়িশা জয়ের স্মারক হিসেবে কাকা বসন্তনারায়ণ রায়ের অনুরোধে প্রতাপাদিত্য পুরী থেকে উৎকলেশ্বর শিবলিঙ্গ ও গোবিন্দদেব বিগ্রহ নিয়ে আসেন। যশোরের গোপালপুরে গোবিন্দদেব মূর্তি প্রতিষ্ঠা হয় এবং বসন্ত রায়ের উদ্যোগে বেদকাশীতে মন্দির নির্মাণ করে উৎকলেশ্বর মূর্তি স্থাপিত হয়।

মুঘলদের বাণিজ্য কেন্দ্র দখল করতে এগিয়ে যান প্রত্যাপাদিত্য। শুরু হয় সাতগাহের যুদ্ধ। এবার প্রতাপাদিত্যের নজর পড়ে পশ্চিমে মুঘল সাম্রাজ্যের দিকে। পূর্ব ভারতে মুঘলদের বাণিজ্যের অন্যতম অর্থকরী কেন্দ্র ছিল সাতগাহ নৌবন্দর। প্রতাপাদিত্য এই বন্দর দখল করে মুঘলদের অর্থনৈতিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করার সিদ্ধান্ত নেন। ১৫৯২ খ্রিস্টাব্দে ৬৪ দাঁড়বিশিষ্ট ১০০টি যুদ্ধনৌকা সহযোগে আক্রমণ করেন। প্রতাপের পর্তুগিজ সেনাপতি ফ্রান্সিসকো রডা বিধ্বংসী কামানবাহিনী নিয়ে সাতগাহ আক্রমণ করেন। সাতগাহের মুঘল শাসক এই অতর্কিত আক্রমণের জন্য প্রস্তুত ছিল না। হুগলি নদীর পশ্চিম তীরে মুঘল সেনা যশোর সৈন্যবাহিনীকে বাধা দেওয়ার চেষ্টা করে, কিন্তু যশোরের নৌবাহিনীর আক্রমণ ও অগণিত গোলাবর্ষণে মুঘলদের সলিলসমাধি ঘটে। প্রতাপাদিত্য সাতগাহ বিজয় করে এটিকে যশোর সাম্রাজ্যের প্রধান বন্দর হিসেবে প্রতিষ্ঠা করেন।

প্রতাপাদিত্যের সাম্রাজ্যের পরিসীমা ভারতবর্ষে প্রসারিত হচ্ছিল। মুঘল বাদশা আকবর প্রতাপের ক্ষমতা নির্মূল করবার জন্য আজিম খাঁ নামে এক সেনাপতিকে বহু দক্ষ সেনা, অস্ত্র সহ বঙ্গ আক্রমণের জন্য পাঠান। আজিম তার সেনাবাহিনী নিয়ে পাটনা ও রাজমহল অতিক্রম করে বাঙ্গলার দিকে এগোতে থাকে। প্রতাপের পূর্ব নির্দেশমতো কেউ তাকে বাধা দিল না। পরিস্থিতি শান্ত বিবেচনা করে আজিম খান রায়গড়ের কাছে বাঙ্গলার সীমানায় সেনা শিবির খাটিয়ে বিশ্রাম করতে থাকে। এই অবস্থায় ভোর রাত্রে প্রতাপাদিত্য সৈন্যবাহিনী-সহ চতুর্দিক থেকে প্রবল বিক্রমে মুঘল সেনার উপর আক্রমণ করে। এই আকস্মিক আক্রমণে মুঘল সেনা বিধ্বস্ত হয়ে পড়ে। দুই পক্ষে ভীষণ যুদ্ধ হয়। এই ভীষণ যুদ্ধে আজিম খান নিহত হয়, প্রায় বিশ হাজার মুঘল সৈন্য নিহত ও বন্দি হয়। এদিকে বন্দি ২ হাজার মুঘল সেনাও যশোর বাহিনীতে যোগদান করে সাম্রাজ্যের শক্তিবৃদ্ধি করে।

রাজমহলের যুদ্ধ জয় করে প্রতাপাদিত্য পূর্ব ভারতের মুঘল শাসনের পতন ঘটান। একের পর এক যুদ্ধ জয়ের ফলে প্রতাপাদিত্যের সামরিক

মা যশোরেশ্বরীকে প্রণাম করছেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী (ফাইল চিত্র)

আধিপত্য সারা ভারতবর্ষে প্রচারিত হতে থাকে। এই অবস্থায় তিনি পূর্ব ভারতের মুঘল রাজধানী রাজমহল আক্রমণের সিদ্ধান্ত নেন। আসন্ন যুদ্ধের জন্য কূটনৈতিক পরিকল্পনা শুরু করেন তাঁর বীর সেনাপতি শঙ্কর চক্রবর্তী। ৫ হাজার অশ্বারোহী বাহিনী-সহ সেনাপতি প্রতাপসিংহ দত্ত একদিকে, অন্যদিকে সেনাপতি কালীদাস ঢালী ২০ হাজার ঢালী বাহিনী নিয়ে প্রস্তুত হতে থাকে। কিছু দিনের মধ্যেই পঁচিশ হাজার সৈন্য নিয়ে মহারাজ প্রতাপাদিত্য রাজমহল আক্রমণ করেন। এসময় রাজমহলের মুঘল সুবেদার ছিল নবাব শের খান। গঙ্গার তীরে রাজমহলে শের খাঁর নবাব বাহিনীর সঙ্গে যশোর রাজসৈন্যের প্রবল যুদ্ধ হয়। অবশেষে নবাব সৈন্যের পরাজয় হয় ও শের খাঁ প্রাণভয়ে দিল্লি পালিয়ে যায়। মহারাজ প্রতাপাদিত্য রাজমহল জয় করে পূর্ব ভারতের মুঘল রাজধানীর পতন ঘটান। সারা দেশ জুড়ে প্রচার হয়ে যায় যে হিন্দুস্থানকে শাসন করা মুঘল বাদশাহ, বাঙ্গলার রাজা প্রতাপাদিত্যের কাছে একের পর এক যুদ্ধে শোচনীয়ভাবে পরাজিত হচ্ছে।

পাটনা বিজয় করে প্রত্যাপাদিত্য অখণ্ড যশোর সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। পূর্ব ভারতে মুঘলদের একমাত্র দুর্গ ছিল পাটনাতে সুবাহ-এ-বিহার। সালটা ১৫৯৮ খ্রিস্টাব্দ। তৎকালীন পাটনার শাসক শেখ ইব্রাহিম খান সেলিম আশঙ্কা করছিল, রাজমহল জয়ের পর প্রতাপাদিত্য পাটনা আক্রমণ করতে পারেন। তাই সে সীমান্তে মুঘল সেনা প্রস্তুত রাখে। এদিকে প্রতাপাদিত্য গঙ্গাপার করে বিহারে প্রবেশ করেন। পাটনার কাছে মোটালাগড়ে মুঘল সেনার সঙ্গে যশোর সেনার যুদ্ধ হয়। আক্রমণাত্মক যশোর সৈন্যবাহিনীর সর্দার শঙ্কর চক্রবর্তীর পরিকল্পনা অনুসারে ত্রিমুখী আক্রমণে অধিকাংশ মুঘল সৈন্যই নিহত হয়, ইব্রাহিম খান পরাজয় স্বীকার করে ও তাকে বন্দি করা হয়। প্রত্যাপাদিত্য পাটনা বিজয় করে নেন। সমগ্র বঙ্গ বিহার ও ওড়িশা একত্রে বৃহৎবঙ্গ জুড়ে রায়শ্রেষ্ঠ প্রতাপাদিত্যের যশোর সাম্রাজ্যের বিস্তার হয়। সমগ্র পূর্বভারতে হিন্দু সাম্রাজ্যের গৌরবের মঙ্গল শঙ্খ বেজে ওঠে।

প্রতাপাদিত্যের অমর কীর্তিগুলি অবশ্যই স্মরণীয়। বারাণসীধামে মহারাজ প্রতাপাদিত্য কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত বিখ্যাত চৌষট্টি ঘাট আজও তাঁর গৌরব অম্লান রেখে চলেছে। যশোর রাজ্যের স্বাধীন নৃপতি হিসেবে মহারাজ প্রতাপাদিত্য নিজ নামাঙ্কিত রৌপ্যমুদ্রা প্রচলন করেন। বিহার জয়ের স্মারক হিসেবে সেনাপতি শঙ্কর চক্রবর্তী মিথিলার দ্বারভাঙ্গার হায়াঘাটে জগজ্জননী ভগবতী মন্দির স্থাপন করেন। মহারাজ প্রতাপাদিত্য পুণ্যক্ষেত্র কাশীধামে নির্মাণ করেন বিখ্যাত চৌষট্টি যোগিনী মন্দিরও।

মহারাজ প্রতাপাদিত্যের রাজ্যাভিষেকের মাধ্যমে তিনি শুধুমাত্র একজন সমকালীন অন্যান্য বৃহৎ রাজ্যের সমমর্যাদার রাজা হিসেবেই প্রতিষ্ঠিত হলেন না, তার সঙ্গে বাঙ্গলাকে কেন্দ্র করে মধ্যযুগে এক হিন্দু সাম্রাজ্যের উত্থান হয়েছিল। ভারত থেকে বিধর্মী শাসনের উচ্ছেদ ঘটিয়ে স্বতন্ত্র হিন্দুরাজ্য প্রতিষ্ঠা করে হিন্দু পুনরুজ্জীবনের পথ প্রশস্ত করেন।

nmc

JAS-ANZ

NEUTRAL VERITAS TRANSPARENT

NANDA MILLAR COMPANY

Engineers s Consultants
Manufacturers s Exporters

1/2, Chanditala Branch Road,
(Near Behala Chandi Mandir)
Kolkata - 700 053, India
Phone : 24030411
Mobile : 98300 78763, Fax : 91-33-24030411
E-mail : nmc@nandagroup.com
Web Site : www.nandagroup.com

With Best Compliments From :

M/s. OUTBOX CARGO SERVICES LLP

SAGAR ESTATE BUILDING
2, N.C. DUTTA SARANI
ROOM NO. 2, 3RD FLOOR
KOLKATA - 700001

KAMAL AGARWAL
Contact No.
M : 98300 23126
O : 91-33-40033326 / 40055518
Fax : 91-33-2230-6490
e-mail : info@outboxcargo.com

বাঙ্গালি সাঁতারু ঈশানী ঘোষকে এখনও মনে রেখেছে ক্রীড়াজগৎ

সম্রাট শীল ॥ আশি-নব্বইয়ের দশকে ক্রীড়াজগতে দাপিয়ে জায়গা করছিলেন মহিলারা। ক্রীড়াবিভাগে জাতীয় আন্তর্জাতিক স্তর থেকে শুরু করে এশিয়াড ও অলিম্পিকেও জায়গা করে নিয়েছিলেন তাঁরা। ৭৭নং শ্যামবাজার স্ট্রিটের শ্রীমতী রীতা ঘোষ ও নিতাই ঘোষের একমাত্র কন্যা ঈশানী ঘোষ বাবার ও মায়ের অদম্য উৎসাহে ১৯৮২ সালে প্রথম গঙ্গায় সাঁতারের প্রশিক্ষণ নেওয়া শুরু করলেন। ১৯৮৫ সালে ৪ বছর বয়সে হেদুয়াতে ন্যাশানাল সুইমিং অ্যাসোসিয়েশনে ভর্তি হলেন।

পড়াশোনার পাশাপাশি সাঁতারের প্রশিক্ষণ চলতে লাগল। ১৯৮৬ সালে প্রথম আন্তর্জাতিক স্তরের প্রতিযোগিতা মুম্বই সাবজুনিয়ারে অংশগ্রহণ করার মধ্য দিয়ে শুরু হলো নিজেকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার যুদ্ধ। সাহস, প্রচেষ্টা, ভালোবাসা, অধ্যবসায়, ধ্যান-জ্ঞান সবটাই ছিল তাঁর জলের সঙ্গে। তারপর ঈশানীর ঝুলিতে আসতে লাগল একের পর এক সাফল্য। ১৯৮৭ সালে লক্ষ্ণৌ সাব জুনিয়ার বিভাগে চতুর্থ, ১৯৮৮-তে গৌহাটী ১৫১.৪৫ পয়েন্ট পেয়ে নতুন রেকর্ড গড়ে তৃতীয় স্থান অর্জন করেন। ১৯৮৯-তে ব্যাঙ্গালোরে সাবজুনিয়ার বিভাগে ১৪২.৪৫/১৪১.৬০ পয়েন্ট পেয়ে নতুন রেকর্ড গড়ে দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থানাধিকার করলেন।

এরপরেও থেমে থাকেনি তার যুদ্ধ। পর পর বছরে রেকর্ড গড়ে ফেললেন ঈশানী ঘোষ। ১৯৯০ সালে বোম্বে ও কলকাতা, ১৯৯১-এ গোয়া, ১৯৯৬-এ কেরালা ও ভোপালে বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় তিনি তখন শীর্ষস্থানে।

সেই ঝলমলে সময়ে বেশ কিছু আধিকারিকদের নজরে পড়ে ঈশানীর ওপর। কেউ কেউ তাকে জায়গা দিলেও বেশিরভাগ ঈশানীকে উপহাস করতে শুরু করে। প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণে রাজনীতির নোংরা খেলার শিকার হলেন ঈশানী ঘোষ, কিন্তু থামানো যায়নি তাঁকে। জলকে ভালোবেসেছিলেন বলেই জলও তাকে ফেরাতে পারেনি। অধ্যবসায় ও প্রচেষ্টার মাধ্যমে তিনি ১৯৯৪ সালে ডাইভিং-এ সিনিয়র বিভাগে প্রথম স্থান লাভ করেন ভোপালে এবং ১৯৯৫ সালে হাইবোর্ড-এ ২৬০.৭০ পয়েন্ট লাভ করে রেকর্ড গড়ে প্রথম স্থান অধিকার করেন।

এরপর ১৯৯৫ সালে শ্রীলঙ্কায় নবমতম এশিয়াডে সুযোগ পেলেন ঈশানী। হাইবোর্ডে ২৫৯.৯৫ পয়েন্ট পেয়ে রেকর্ড গড়ে প্রথম স্থান অধিকার করেন সোনার মেডেল জয় করে ঘরে ফিরল সোনার মেয়ে ঈশানী ঘোষ। দিকে দিকে জয়জয়কার, নাম ছড়িয়ে পড়ল। নানা দিক থেকে ডাক, একের পর এক সংবর্ধনা। পশ্চিমবঙ্গের ক্রীড়া মঞ্চে এক জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত স্থাপন করলেন সাঁতারু ঈশানী ঘোষ।

ইচ্ছাশক্তি তাকে আরও এগিয়ে নিয়ে গেল। ১৯৯৬ সালে জয়পুর, ইন্দোর, কোরিয়ায় পরপর সাফল্য। ১০ম এশিয়াডে আবার ডাক পেলেন ঈশানী। সেখানেও সফল হয়ে ১৯৯৭ সালে ত্রিবান্দ্রম, ব্যাঙ্গালোর ও কৌশিং-এ পর পর নিজের জায়গা দখল করে সফলতা লাভ করেন তিনি। ১৯৯৮ সালে পুনেতে আবার হাইবোর্ডে প্রথমস্থান পান। ১৯৯৮ সালে মালয়েশিয়াতে অনুষ্ঠিত ১১ ও ১২তম এশিয়াডেও একের পর এক সফলতা। থেমে থাকেননি ঈশানী। এর মধ্যে উচ্চমাধ্যমিকে (১৯৯৭) সাফল্যের সঙ্গে উত্তীর্ণ হওয়ার পর ১৯৯৮-এ মালয়েশিয়ার শাহ আলম শিলানগরে মেয়েদের বিভাগে চ্যাম্পিয়নশিপে দ্বিতীয়স্থান, সেই বছরই ব্যাঙ্গালোর হাইবোর্ড ডাইভিং-এ ৩১০.০৫ পয়েন্ট পেয়ে রেকর্ড গড়ে প্রথমস্থান অর্জন করেন। খেতাব পেলেন '৫৩তম ন্যাশানাল অ্যাকোয়াটিক চ্যাম্পিয়ানশিপে' দেশে, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক স্তরে প্রচুর সম্মান ও খেতাব জয় করে শীর্ষস্থানে এলেন।

১৯৯৭-৯৮ সালে ক্যালকাটা প্রেসক্লাবে বর্ষসেরা খেতাব, ১৯৯৭ সালে সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় পুরস্কারে ও সম্মানে ভূষিত করেন ঈশানীকে। ১৯৯৯ সালে দিল্লিতে অনুষ্ঠিত সিনিয়ার ন্যাশানালে প্রথমস্থান, ১৯৯৯-এ এশিয়াডে দ্বিতীয়স্থান স্পিংবোর্ড ডিভিশনে। ১৯৯৯ সালে জার্মানি অলিম্পিকে তালিকাভুক্ত ছিলেন তিনি। বর্তমানে গার্ডেনরীচে South Eastern Railway-তে একটি উচ্চ পদে কর্মরত। ভারত পেয়েছিল আরতি সাহাকে আর সেই সময় পশ্চিমবঙ্গ পেল ঈশানী ঘোষকে।

ঈশানী আগামী প্রজন্মের কাছে এক জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত। তিনি দেখিয়ে দিয়েছেন নিজের চেষ্টা থাকলে বিশ্বজয় করা যায়। ক্রীড়া বিভাগে পশ্চিমবঙ্গের ঈশানী ঘোষের নাম স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে। আজ যারা এগিয়ে চলেছেন তারা ঈশানীর যুদ্ধ জয়ের ইতিহাস পড়ে উজ্জীবিত হবেন, আগামী দিনে ঘরে ঘরে তৈরি হবে অনেক ঈশানী। □

ইতিহাসের গল্প

নবাঙ্কুর

অলৌকিক আলোকরশ্মি

মহারাজা প্রতাপাদিত্য দাঁড়িয়ে আছেন যশোর রাজপ্রাসাদের অলিন্দে। 'আল্লা হো আকবর' ধ্বনি শুনে দুই কান চাপা দেন তিনি। বাঙ্গালি হিন্দু জাতীয়তাবোধের স্বপ্ন তাঁর দুই চোখে। দিল্লির সিংহাসনে কি কোনোদিন বাঙ্গালি হিন্দু বসতে পারবে না?

বারো ভুঁইয়ার অন্যতম প্রতাপাদিত্য আজ প্রণম্য, শ্রদ্ধেয়। 'বারো ভুঁইয়া' বলতেই প্রথমে মানুষের মনে প্রতাপাদিত্যের নামই মনে আসে। তবু কোথায় যেন এক অপ্রাপ্তির বেদনা, বিষন্নতার মতোই তাঁকে ঘিরে রাখে। কানে আসছে তাঁর নিজের পদাতিক সেনাবাহিনীর মহড়ার শব্দ, অশ্বারোহী বাহিনীর শোরগোল আর অশ্বের হ্রেষাধ্বনি। মনে হয়, কোনো দৈব আশীর্বাদে যদি মনে কিছুটা প্রশান্তি আসত। যুদ্ধবিগ্রহ আর ভালো লাগে না। বড়ো ইচ্ছে করে স্ত্রী-পুত্র-কন্যা নিয়ে শান্ত সংসারযাত্রা নির্বাহ করতে।

হঠাৎ তিনি দেখলেন, রাজপ্রাসাদের সদর দরজা দিয়ে ছুটে আসছেন প্রধান সেনাপতি। প্রতাপাদিত্যের ভ্রূযুগল কুঞ্চিত হয়ে উঠল। আবার কি কোথাও শত্রু আক্রমণ? মুঘল বাদশা কি যশোরের বিরুদ্ধে যুদ্ধাভিযান করেছে? প্রতাপাদিত্যের পাঠকক্ষের বাইরে থেকে শোনা গেল সেনাপতির কণ্ঠস্বর— 'মহারাজ, অপরাধ ক্ষমা করবেন, একবার দরজা খুলুন।'

প্রতাপাদিত্য দরজা খুললেন। বললেন— কী ব্যাপার? আমি তো এক্ষুনি যেতাম সভাকক্ষে।

সেনাপতি বললেন— 'মহারাজ, মনে হলো খবরটা এখনই আপনাকে দেওয়া দরকার, তাই ছুটে এলাম। জঙ্গলে সৈন্যদের মহড়ার সময়ই ঘটনাটি ঘটল।'

— আঃ! কী ঘটেছে সেটাই বলুন। অত ভণিতার প্রয়োজন নেই।' অধৈর্য কণ্ঠ প্রতাপাদিত্যের।

-- মহারাজ, হঠাৎ দেখলাম জঙ্গলে তীব্র এক আলোকরশ্মি। কোথা থেকে আসছে বুঝতে পারলাম না। ভাবলাম আপনাকে আগে খবরটা দিই।'

প্রতাপাদিত্য ব্যঙ্গের হাসি হেসে বললেন-- চলুন, আলোর উৎসটা কী, সেটা ভালোভাবে দেখে আসি।'

— মহারাজ, ভালো করে বর্ম এঁটে নিন। শত্রুর কোনো নতুন কৌশলও হতে পারে।

— তাহলে আপনারা কী করতে আছেন, আর আমার সুশিক্ষিত সেনাবাহিনী?

মহারাজ সদলবলে চললেন জঙ্গল অভিমুখে। জঙ্গলে প্রবেশ করা মাত্রই তীব্র আলোকরশ্মি তাঁর চোখে পড়ল। আলোকিত পথ ধরে এগিয়ে চললেন মহারাজ। পেছনে সেনাপতি। হঠাৎ চোখে পড়ল এক অভাবিত দৃশ্য— এক জ্যোতির্ময়ী মা কালীর বিগ্রহ। তার থেকে বিচ্ছুরিত অলোতেই আলোকিত সারা জঙ্গল। সেনাপতির উদ্দেশে মহারাজা বললেন— সেনাপতি, এই দেবী দয়া করে আমাদের দর্শন দিয়েছেন। বিগ্রহ আমাদের নির্মাণ করতে হয়নি। তিনি নিজেই পূর্ণাঙ্গ বিগ্রহরূপিনী হয়ে আমাদের কাছে এসেছেন। আমার মন হলছে, ইনিই আমাদের যশোর রাজ্যের অধিষ্ঠাত্রী দেবী।

মহারাজ ভূমিষ্ঠ হয়ে প্রণাম করে বললেন, আমি এই দেবীর নাম রাখলাম 'মা যশোরেশ্বরী'। মন্দির স্থাপন করে আমি এই দেবীকে প্রতিষ্ঠা করব। যশোর রাজ্যের মান-সম্মান, ভালো-মন্দ সবকিছু আমি দেবীর চরণে অর্পণ করলাম। আগামীকাল থেকেই মন্দির নির্মাণের কাজ শুরু হবে।

বহুদূর থেকে ভেসে এল শঙ্খ-ঘণ্টার ধ্বনি, সুললিত কণ্ঠে পুরোহিতের মন্ত্রপাঠ। মহারাজ ভিন্ন আর কারও শ্রুতিগোচর হয়নি সেই অলৌকিক ধ্বনি। প্রতাপাদিত্য হাত জোড় করে কপালে ঠেকালেন— জয় মা যশোরেশ্বরী।

সমবেত ধ্বনিতে মুখরিত হলো বনাঞ্চল।

—রূপশ্রী দত্ত

নদ-নদী পরিচয়

উত্তরবঙ্গের নদী

(গত সংখ্যার পর) রামথি, রেল্লিখোলা, খুমানি, রঙ্গো,চেল,ডালিং, লিস, নেওড়া, ঘিস, মূর্তি, ডায়না, ঘাটিয়া, কুজি ডায়না, চুনপাতাং, কুর্তি, সুখানি, জুরান্তি, মিংলাম, কুমলাই, খুলনাল, দোদোমারি, করলা, করতোয়া, শাওঁ, মাল, জেতি, সুরসুতি, চাওয়াই, পাঙ্গা, কুড়ুম, মুনজাই, মানসাই, সুটুঙ্গা, ঘোড়ামারা, চামুর্চি, আংরাভাষা, গরাতি, ইংডং, গোলুন্দি, নোমাই, ভেরসা, কুলিক, নাগর, সুধানি, টাঙ্গন, গামারি, সুই, নোনা, গন্দর, শ্রীমতী, দলঞ্চা, সুধা, পিতানি, যমুনা(পঞ্চগড়), দোমোহনা, হাড়ভাঙা, পুনর্ভবা, বালিয়াখাঁড়ি, ব্রাহ্মণী, ইছামতি, খাগড়া, শ্রী, ছোট যমুনা, কাশিয়ানি, চিরি, তুলাই, তেতুলিয়া,রাহামাটি, পানা, ডিমা, রায়ডাক, বালা, গাবুর বাসরা, হলং, ডিমডিমা। (ক্রমশ)

এসো সংস্কৃত শিখি– ১৮

একত্র (একসঙ্গে)
পুষ্প গুচ্ছ: একত্র অস্তি।
পুষ্পগুচ্ছ একসঙ্গে আছে।
পুষ্প গুচ্ছ: কুত্র অস্তি?
পুষ্পগুচ্ছ কোথায় আছে?

অভ্যাস করি–

বালকসমূহ:একত্রঅস্তি। দুষ্টদলম একত্র অস্তি। ধনরাশি:একত্রঅস্তি। মেঘ মালা একত্র অস্তি। ধনম একত্র অস্তি। জলম একত্র অস্তি। যুবসমাজ একত্র অস্তি। শিক্ষকমণ্ডলী একত্র আস্তি।
পরীক্ষা কুত্র অস্তি? পরীক্ষা – –।
বৃষ্টি: – – ? – –।
দীপপুঞ্জ:, প্রাণিবর্গ শিক্ষকবৃন্দ:, কুসুমদাম:, সভ্যসমাজ:।

প্রয়োগ করি—

একত্র দ্বারা দ্বিত্রাণি বাক্যানি বদতু –
একত্র কিং কিম অস্তি? ধূলি:, ধ্বনি:, কোলাহল:, পঠনম।

ভালো কথা

দোলযাত্রা

এবার দোলের দিন সকাল সাড়ে সাতটায় আমাদের শাখা শুরু হলো। শাখা শুরুর পর আমরা সবাই একে একে ধ্বজস্থানে আবির দিলাম। প্রার্থনার পর পরস্পর পরস্পরকে আবির মাখালাম। তখনি আমরা কেউ কাউকে চিনতে পারছিলাম না। সবাইকে ভূতের মতো লাগছিল। তারপরে আমরা দল বেঁধে পাড়ায় বেরুলাম।। আমার কাকাই (নগর কার্যবাহ), দেবুদা, অশোকদা, কুণালদা-সহ সঙ্গে বড়োরা ছিলেন। ছোটোদের সংখ্যা বেশি ছিল। আমার বোন পপি ও ভাই বিভুও ছিল। আমরা স্বয়ংসেবকদের বাড়ি বাড়ি যাচ্ছিলাম। তবে রাস্তায়ও সবাইকে রং মাখাচ্ছিলাম। আশেপাশের বাড়ির ছাদ থেকে বেলুনভর্তি রং ছুড়ে মারছিল। বাড়িতে বাড়িতে কোথাও মিষ্টি, কোথাও প্রসাদ দিচ্ছিল। আমাদের বাড়িতে ঠাকুরদা, ঠাকুমা ও বাবা মিলে সবাইকে মিষ্টি দিয়েছে। সেদিন প্রায় তিন ঘণ্টা আমরা ঘুরেছি। খুব আনন্দ হয়েছিল।

বিষ্ণু ঘোষ, ষষ্ঠশ্রেণী, টিপি রোড, কলকাতা-৬।

তোমার দেখা বা তোমার সঙ্গে ঘটা এরকম ভালো কোনো ঘটনা যদি থেকে থাকে তাহলে চটপট লিখে পাঠাও আমাদের ঠিকানায়।

কবিতা

ভোট

বিশ্বজিৎ চৌধুরী, দ্বাদশশ্রেণী, শিলচর, অসম।

পাঁচবছর পর পর ভোট
তৈরি হয় নতুন জোট।
নতুন জোটের একটি লক্ষ্য
হারাবে তারা মোদী পক্ষ।
নতুন জোট ভ্রষ্টাচারী
কেউ কেউ আবার অত্যাচারী
সবাই তারা রামবিরোধী
জিতলে পরে করবে কী?

মোদীর নামে গালাগালি
প্রধানমন্ত্রী! সে তাদের গুড়েবালি
জিততে চায় তবু তারা
দেশকে যে করবে সারা!
ভারতবাসীর ভাগ্য ভালো
মোদীর মতো নেতা পেল।
মোদীর হাতেই যুগের শুরু
ভারত হবে বিশ্বগুরু।

লেখা পাঠাতে হবে এই ঠিকানায়

নবাঙ্কুর বিভাগ
স্বস্তিকা
২৭/১বি, বিধান সরণি
কলকাতা - ৭০০ ০০৬
হোয়াটস্ অ্যাপ - 8420240584

E-mail : swastika5915@gmail.com

ফোন, এস এম এস বা ই-মেল করা যেতে পারে।
(পঞ্চম থেকে দ্বাদশ শ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রীরাই উত্তর পাঠাতে পারবে)

যোগ চিকিৎসা

যে কোনো শারীরিক-মানসিক রোগ, মেধা স্মৃতি-বুদ্ধি বৃদ্ধি, পড়াশুনায় উন্নতি— বিশিষ্ট যোগ চিকিৎসক-গবেষক অধ্যাপক দীপেন সেনগুপ্তের তত্ত্বাবধানে সম্পূর্ণ ভারতীয় পদ্ধতিতে মাত্র ৪০০০ টাকায় ভর্তির দিন থেকে ১ বৎসর যোগ চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়েছে। চার বৎসর বয়স থেকে সদস্য/সদস্যা নেওয়া হচ্ছে।

স্বামী সন্তদাস ইনস্টিটিউট অব কালচার যৌগিক কলেজ

১০১, সাদার্ন অ্যাভিনিউ, কলকাতা-২৯

ফোন : ৯৮৩০৫৯৭৮৮৪

৯০৫১৭২১৪২০

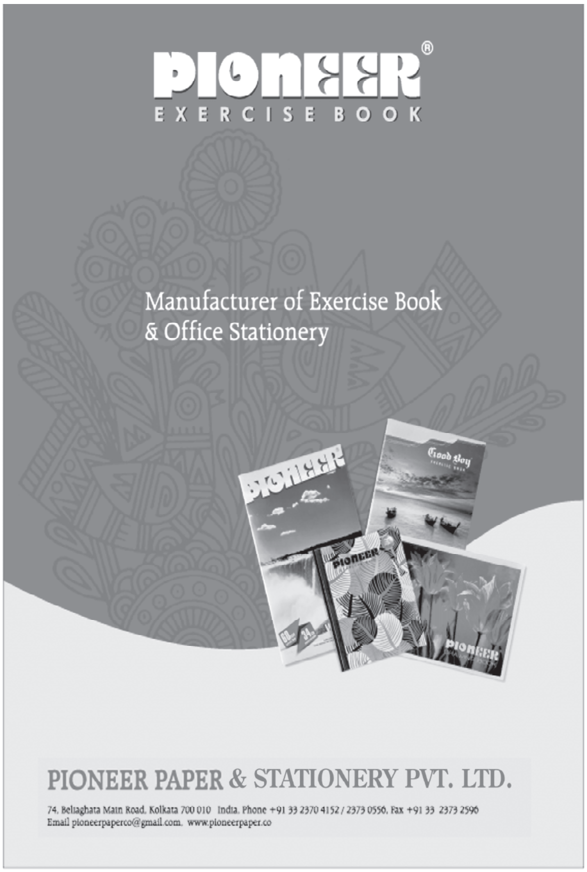

With Best Compliments from -

A

Well wisher

স্বামী প্রণবানন্দ থেকে শ্রীগুরুজী

সাংস্কৃতিক জাতীয়তার ধারা

রবি রঞ্জন সেন

খ্রিস্টীয় দ্বাদশ শতাব্দী থেকে ভারতবর্ষ তার স্বাধীনতা হারিয়ে তুর্কি-পাঠান মুসলমানদের সঙ্গে জীবন-মরণের সংঘর্ষে দীর্ঘকাল লিপ্ত ছিল যার অন্তিমে অষ্টাদশ শতাব্দীতে ইসলামিক শক্তি পরাজিত হলেও অরাজকতার সুযোগ নিয়ে রাজক্ষমতা ছিনিয়ে নিল ব্রিটিশ। কিছুকাল শাসন করে তারা বুঝল যে ভারতে তাদের দখলকে পাকাপোক্ত করার জন্য ভারতীয়দের চিন্তা-চেতনা পরিবর্তন করা দরকার— 'শিক্ষা' নামক মগজধোলাই ব্যবস্থার অপব্যবহারে ভারতে এমন এক শ্রেণী তৈরি করার ছক ব্রিটিশ কষে যে শ্রেণী নিজেদের সংস্কৃতি-ঐতিহ্য- পরম্পরাকে ঘৃণা করবে, পাশ্চাত্যের চশমা চোখে দিয়ে নিজেদের ইতিহাসকে দেখবে আর গোরা সাহেবদের দাসত্বকে আশীর্বাদ বলে মেনে নেবে।

কিন্তু এই পরিকল্পনায় বাদ সাধলেন কয়েকজন অনন্য মনীষী যাঁরা উনবিংশ শতাব্দীতে ভারতকে পুনর্জাগরণের পথ দেখালেন। এদেশের আত্মপরিচয়কে বিলুপ্ত করার দিবাস্বপ্নকে ব্যর্থ করে আবির্ভূত হলেন সেই সমস্ত মহামানব যাঁরা উপনিবেশবাদী কালে আমাদের ধর্ম, সাহিত্য, রাজনীতি, সমাজনীতিকে নতুনভাবে ঢেলে সাজিয়ে সূচনা করলেন উনবিংশ শতাব্দীর নবজাগরণ। এলেন স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতী (১৮২৪), শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস (১৮৩৬), বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (১৮৩৮), রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৬১), স্বামী বিবেকানন্দ (১৮৬৩), শ্রীঅরবিন্দ (১৮৭২), বীর বিনায়ক দামোদর সাভারকর (১৮৮৩), ডাঃ হেডগেওয়ার (১৮৮৯), সুভাষচন্দ্র বসু (১৮৯৭)-সহ আরও বহু উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিত্ব। এই ধারারই অঙ্গরূপে জন্ম নিলেন ভারতের সাংস্কৃতিক জাতীয়তাবোধের ধ্বজাধারী এমনই দুই উজ্জ্বল নক্ষত্র— ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের প্রতিষ্ঠাতা যুগাচার্য শ্রীমৎ স্বামী প্রণবানন্দজী মহারাজ এবং রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের দ্বিতীয় সরসঙ্ঘচালক শ্রীমাধবরাও সদাশিবরাও গোলওয়ালকর (শ্রীগুরুজী)।

স্বামী প্রণবানন্দ (১৮৯৬-১৯৪০) ও শ্রীগোলওয়ালকর (১৯০৬-১৯৭৩) উভয়েই সাংস্কৃতিক জাতীয়তাবোধকে নতুন রূপ প্রদান করেছিলেন, পুরাতন অচল রীতিপ্রথাকে ঝেড়ে ফেলে সমাজজীবনকে যুগোপযোগী করে তুলেছিলেন, সেযুগের বিভিন্ন রাজনৈতিক মতামতের বিভ্রান্তির ঊর্ধ্বে উঠে জাতিকে নতুন দিশা দেখিয়েছিলেন, বর্তমান যুগে কালজয়ী ভারতীয় সংস্কৃতি ও মূল্যবোধের প্রাসঙ্গিকতা তুলে ধরেছিলেন এবং সর্বোপরি নিজেদের সমগ্র জীবনকে অপরের জন্য, দেশ, সমাজ ও বিশ্বমানবের জন্য উৎসর্গ করে আমাদের সামনে জ্বলন্ত উদাহরণ রেখে গেছেন।

স্বামী প্রণবানন্দ জন্মগ্রহণ করেন ২৯ জানুয়ারি ১৮৯৬ (১৬ মাঘ, ১৩০২ বঙ্গাব্দ, মাঘী পূর্ণিমা) বর্তমান বাংলাদেশের ফরিদপুর জেলার বাজিতপুর গ্রামে। তাঁর পিতা শ্রীবিষ্ণুচরণ ভুঁঞা এবং মাতা সারদাদেবী ছিলেন ধার্মিক প্রকৃতির এবং গৃহদেবতা নীলরুদ্রের ভক্ত। পূর্বাশ্রমে তাঁর নাম ছিল বিনোদ। বাল্যকাল থেকেই তিনি অনন্য— একদিকে যেমন তপস্যা-ধ্যান-সমাধিতে তাঁর আগ্রহ, অপরদিকে তিনি প্রচণ্ড দৈহিক বলের অধিকারী ছিলেন। গ্রামের মুসলমান দুর্বৃত্তকে উচিত শিক্ষা দিয়ে যেমন সবার সম্ভ্রমের পাত্র হয়ে উঠেছিলেন, তেমনই প্রথম থেকেই সংযম ও ব্রহ্মচর্যের ভিত্তিতে নিজেকে গড়ে তুলেছিলেন। ১৯১৩ সালে সতেরো বছর বয়সে গোরক্ষপুরের অধ্যক্ষ ও নাথপন্থের নেতা মহন্ত গম্ভীরনাথজীর কাছে দীক্ষালাভ করেছিলেন। ১৯১৭ সালে বাজিতপুরেই সিদ্ধিলাভের পর শুরু হয় তাঁর জনসেবামূলক কর্মকাণ্ড। ১৯১৯ সালের প্রচণ্ড ঘূর্ণিঝড়ে পূর্ববঙ্গের মানুষের দুর্দশায় তিনি 'মাদারিপুর সেবাশ্রম' স্থাপন করেছিলেন এবং ত্রাণকাজে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন। পরবর্তী বছরগুলিতে

ফ : ৬

With Best Wishes :-

Radha Electricals Private Limited

Factory :

Jalan Industrial Complex
Gate No. 3, Mouza - Beniara, P.S.- Domjur
Dist. - Howrah - 711 411

With Best Compliments From :

ALLIANCE MILLS (LESSEES) LTD.

18, Netaji Subhas Road, Kolkata-700 001
Phone : 2243-6401 / 02

Quality manufacturers and leading exporters of hessian cloth and bags, sacking cloth and bags and twine

E-mail : alliance@cal12.vsnl.net.in
Fax : 91-33-22202260
GRAM : ALJUTLES

MILLS

Alliance Jute Mills

Jagatdal 24 Paraganas
Phone : 2581-2745 / 2746 (Bhatpara)

বাজিতপুর সেবাশ্রম, খুলনা সেবাশ্রম প্রভৃতি গঠন করেন এই কাজের জন্য, বিশেষ করে ১৯২১ সালের খুলনা দুর্ভিক্ষে সেবাকাজের উদ্দেশ্যে। তরুণদের দল গঠন করে, বিশিষ্ট ব্যক্তিদের সঙ্গে সম্পর্ক করে, মুষ্টিভিক্ষা ও চাঁদা সংগ্রহ করে তিনি দুঃস্থ ও দরিদ্রদের সেবাকাজ চালিয়ে যান। ১৯২২ সালে কলকাতার বাগবাজারে ঘরভাড়া নিয়ে বসবাস শুরু করেন। ১৯২৩-এর মাঘী পূর্ণিমার পুণ্যতিথিতে তাঁর প্রতিষ্ঠিত সঙ্ঘের নামকরণ হয় 'ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘ'। নামকরণ প্রসঙ্গে তিনি বলেছিলেন, 'আমার সঙ্ঘ হবে দ্বিতীয় বুদ্ধের সঙ্ঘ। আমি সমগ্র দেশ ও জাতিকে বুদ্ধ, শঙ্কর, চৈতন্যের মতো নতুন আদর্শ ও তপঃশক্তিতে সঞ্জীবিত করতে চাই।'

১৯২৪ সালের প্রয়াগ অর্ধকুম্ভে স্বামী গোবিন্দানন্দ গিরির কাছে তিনি সন্ন্যাসদীক্ষা গ্রহণ করেন এবং তারপর ভারত সেবাশ্রমের কর্মযজ্ঞ পরিচালনার জন্য নিষ্ঠাবান, কর্মঠ সন্ন্যাসীদল গড়ে তোলেন। কলকাতায় বিভিন্ন স্থান পরিবর্তনের পর ১৯৩২ সালে ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘ অবশেষে বালিগঞ্জে নিজস্ব কার্যালয় স্থাপন করেন যা আজও সঙ্ঘের প্রধান কার্যালয়।

সেবাকাজের সঙ্গে সঙ্গে হিন্দুসমাজের সার্বিক উন্নতি ও সংহতিসাধনের কাজ তিনি হাতে নেন। বিভিন্ন তীর্থস্থানে বিশেষ করে গয়াধামে সাধারণ তীর্থযাত্রীদের সঙ্গে পাণ্ডাদের দুর্ব্যবহার ও আর্থিক শোষণের সমস্যা নিজের অভিজ্ঞতার দ্বারা বুঝতে পেরে সেখানে সেবাশ্রম প্রতিষ্ঠা করলেন যাতে ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান সম্পন্ন করার জন্য তীর্থযাত্রীরা সঠিক পরামর্শ ও আহার-বিশ্রামের সুব্যবস্থা পায়। আজ ভারতের প্রায় সমস্ত তীর্থস্থানে ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘ তীর্থযাত্রীদের এই সুবিধা প্রদান করে থাকে।

অবিভক্ত বঙ্গপ্রদেশের বিভিন্ন স্থানে তিনি তাঁর সন্ন্যাসীদলকে সঙ্গে নিয়ে নিরন্তর ভ্রমণ করে হিন্দুসমাজের ভীত, সন্ত্রস্ত অবস্থা লক্ষ্য করেছিলেন। সর্বত্র তিনি সমাজের মধ্যে শক্তি সঞ্চয়ের বার্তা দিতেন— 'এবার শুধু ফুলের পূজায় হবে না। বীর্যের পূজা চাই। যে দেবতার যে ভাব, যে লীলা, যে অস্ত্রশস্ত্র, তাই দিয়ে পূজা করলে, তবে সেই দেবতার শক্তি ও আশীর্বাদ লাভ ঘটে। শিবের প্রীতি— ত্রিশূলে, শ্রীরামচন্দ্রের প্রীতি— ধনুর্বাণে; শ্রীকৃষ্ণের প্রসন্নতা— সুদর্শনে; দশভুজা দুর্গার প্রীতি— দশপ্রহরণে।' (স্বামী বেদানন্দ, 'শ্রীশ্রীযুগাচার্য- জীবন-চরিত', কলকাতা, ১৪০২, পৃ ০১৩)

তিরিশের দশকের বঙ্গপ্রদেশে আগ্রাসী মুসলমান রাজনীতি ও তার পরিণামস্বরূপ সাম্প্রদায়িক সংঘাতের মাঝে তিনি স্থানে স্থানে হিন্দু সম্মেলনের আয়োজন করেছিলেন। বাঙ্গালি সমাজকে হিন্দুত্বের চেতনা জাগরণের প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করে তিনি বলেছিলেন, 'যে যা, তাকে তাই বলে ডাক দিলে সে সাড়া দেয়। মুসলমানকে মুসলমান বলে ডাক দেওয়া হচ্ছে, তাই সে তাতে সাড়া দিচ্ছে; খ্রিস্টানকে খ্রিস্টান বলে ডাক দেবার লোক আছে, তাই সে-সে ডাকে সাড়া দিচ্ছে; নিজেদের অস্তিত্বও সেইভাবে অনুভব করছে। কিন্তু হিন্দুকে হিন্দু বলে ডাক দেবার লোক নেই! গত একশো বছর ধরে কেউ ডাক দিয়েছে 'ব্রাহ্ম' বলে, কেউ ডেকেছে 'আর্য' বলে, কেউ ডেকেছে ভারতীয় জাতি বলে, কোনো পক্ষ তাকে আখ্যা দিয়ে রেখেছে 'অমুসলমান'; বিরাট ভারতীয় হিন্দু জাতটা অসাড়, অবশ হয়ে আত্মভুলে ঘুমিয়ে রয়েছে। আজ সময় এসেছে হিন্দুকে হিন্দু বলে ডাক দেবার। আমি তাই হিন্দুকে হিন্দু বলে ডাক দিতে চাই; আমি সমগ্র হিন্দু জনসাধারণকে 'আমি হিন্দু' 'আমি হিন্দু' জপ করাবো। এই হিন্দুত্ববোধ জাগার সঙ্গে সঙ্গে তাদের বিলুপ্ত তেজোবীর্য, শক্তি-সামর্থ্য জেগে উঠবে।' ('শ্রীশ্রীযুগাচার্য জীবনচরিত', পৃ. ৩৪৩)

হিন্দু সমাজের অভ্যন্তরে উচ্চ-নীচ ভেদাভেদ দূর করে সমন্বয় সাধনের উদ্দেশ্যে স্থানে স্থানে হিন্দু মিলন মন্দির গড়ে তোলার অভিযান আচার্যদেব শুরু করেন। বহিরাক্রমণ থেকে হিন্দু সমাজকে রক্ষার জন্য হিন্দু রক্ষী দল গড়ে তোলেন। তিনি স্পষ্ট করেছিলেন যে ভারতে জাতিগঠন করতে হবে ধর্মের ভিত্তিতে— 'কংগ্রেস রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ভিত্তিতে ভারতীয় সমষ্টিজীবন গড়ে তুলতে চায়; আমরা ধর্মকে ভিত্তি করে জাতিগঠন করতে চাই।' (উপরোক্ত, পৃ. ৩৭৮)

এই দূরদর্শী যুগপুরুষের জন্মের দশ বছর পর অর্থাৎ ১৯০৬ সালের ১৯ ফেব্রুয়ারি নাগপুরে পিতা সদাশিব ও মাতা লক্ষ্মীবাঈ-এর ঘরে জন্মগ্রহণ করেন মাধব সদাশিব গোলওয়ালকর। বাল্যকাল থেকেই তাঁর প্রবল জ্ঞানপিপাসা; স্মৃতিশক্তি ও পরোপকারী স্বভাব তাঁকে আর চারজনের থেকে পৃথক করে তুলেছিল। পড়াশোনার জন্য তিনি কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হয়ে প্রাণীবিদ্যার স্নাতক ও স্নাতকোত্তর উত্তীর্ণ হন। ছাত্রাবস্থায় পড়াশোনার বাইরেও নানাধরনের বই পড়তেন বিশেষ করে ধর্ম ও দর্শন সম্বন্ধে। তার সঙ্গে কঠোর শরীরচর্চাও করতেন। ১৯৩০-এ কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপক-রূপে যোগদান করেন এবং সেখানেই শ্রীভাইয়াজী দানীর মাধ্যমে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের সংস্পর্শে আসেন। ১৯৩২-এ বিজয়া দশমী উপলক্ষ্যে নাগপুরে গিয়ে সঙ্ঘপ্রতিষ্ঠাতা ড. কেশবরাও বলিরামরাও হেডগেওয়ারের সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয় এবং ডাক্তারজীর কাছে সঙ্ঘের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য সম্বন্ধে জানতে পারেন। বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনাকালে তাঁকে ছাত্ররা 'গুরুজী' সম্বোধন করত এবং এই সম্বোধনেই তিনি সারা জীবন পরিচিত হলেন সঙ্ঘের ও দেশের কাছে 'শ্রীগুরুজী' নামে!

এই সময় তিনি নাগপুরে রামকৃষ্ণ মিশনের সঙ্গে যুক্ত হন। ১৯৩৬-এ গুরুর খোঁজে বেরিয়ে তিনি মুর্শিদাবাদের সারগাছিতে স্বামী অখণ্ডানন্দের কাছে আসেন এবং সেখানে গুরুসেবা ও সাধনায় নিজেকে নিয়োজিত করেন এবং অখণ্ডানন্দজীর কাছে দীক্ষালাভ করেন। কিছুদিন পর গুরুর দেহাবসানের পর নাগপুরে ফিরে গিয়ে ডাক্তার হেডগেওয়ারের অনুরোধে বাকি জীবন সম্পূর্ণভাবে সঙ্ঘকাজে উৎসর্গ করার সংকল্প নেন। ১৯৩৯-এ সঙ্ঘের সরকার্যবাহ নিযুক্ত হন এবং ১৯৪০ সালে ডাক্তারজীর দেহাবসানের পর তাঁর মনোনীত উত্তরাধিকারী রূপে সরসঙ্ঘচালকের

দায়িত্বভার গ্রহণ করেন।

১৯২৫-এর নাগপুরে প্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ এই সময়ে মহারাষ্ট্র ও মধ্যপ্রদেশের বাইরে প্রসারলাভ করতে শুরু করেছে। মৃত্যুর দশ দিন আগে সঙ্ঘ শিবিরে সর্বশেষ ভাষণে ডাক্তারজী বলেছিলেন যে, আজ আমি আমার সামনে হিন্দু রাষ্ট্রের ক্ষুদ্র প্রতিরূপ দেখতে পাচ্ছি। আগামী ৩৩ বছর ধরে এই শিশুরূপ সংগঠনটিকে লালনপালন করে তাকে ভারতের সমাজ জীবনে প্রতিষ্ঠিত করে বিভিন্ন আনুষঙ্গিক শাখা-প্রশাখার বীজ বপন করে তাকে মহীরুহে পরিণত করার গুরদায়িত্ব ন্যস্ত হলো ৩৪ বছর বয়সি গোলওয়ালকরের স্কন্ধে। এই কাজ তিনি এতটাই পারদর্শিতার সঙ্গে পালন করেছিলেন যে সঙ্ঘ এবং তার আনুষঙ্গিক সংগঠনগুলি স্বাধীনোত্তর ভারতের পুনরুত্থানের অন্যতম কাণ্ডারিরূপে আত্মপ্রকাশ করেছে।

সরসঙ্ঘচালক রূপে শ্রীগুরুজীর কার্যকাল সঙ্ঘ ও দেশের সামনে বহু সমস্যায় জর্জরিত সময় কাল ছিল--- প্রথমেই দেশভাগের দাবি ও তার সঙ্গে আছড়ে পড়ে পূর্ব ও পশ্চিম প্রান্তে হিন্দু সমাজের উপর ভয়ংকর আক্রমণ। দায়িত্বভার গ্রহণের ঠিক তিন মাস আগেই লাহোর অধিবেশনে মুসলিম লিগ 'পাকিস্তান প্রস্তাব' অনুমোদন করে এবং তারপর ১৯৪৬-এর 'প্রত্যক্ষ সংগ্রাম দিবস', কলকাতা, নোয়াখালি, বিহার, পঞ্জাব ও দিল্লির জিহাদি তাণ্ডব— লুঠ, ধর্ষণ, গণহত্যা। কিন্তু সমাজের সুরক্ষা ও প্রতিরোধের ব্যবস্থা এবং দেশভাগের পর শরণার্থীদের ত্রাণ ও পুনর্বাসনের কাজে তাঁর নেতৃত্বে সঙ্ঘের স্বয়ংসেবকরা আত্মনিয়োগ করে। দেশভাগের ঠিক এক সপ্তাহ আগে ৮ আগস্ট পর্যন্ত শ্রীগুরুজী পশ্চিম পঞ্জাব ও সিন্ধ ভ্রমণ করেছিলেন। ওই পরিস্থিতির মাঝেই গান্ধীহত্যার মিথ্যা অভিযোগে নেমে আসে সঙ্ঘের উপর রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত নিষেধাজ্ঞা। এই পরীক্ষায় তিনি সফলভাবে উত্তীর্ণ হন। অবশেষে ভারত সরকারকে নিষেধাজ্ঞা তুলে ফেলতে হয়। তাঁর মেয়াদকালে পাকিস্তানের সঙ্গে তিনটি যুদ্ধ এবং চীনের সঙ্গে একটি যুদ্ধেও তাঁর নেতৃত্বে সঙ্ঘের স্বয়ংসেবকরা দেশের জন্য উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে। স্বাধীনতার দু' মাস পরও যখন জম্মু-কাশ্মীরের মহারাজা হরি সিংহ ভারতের সঙ্গে বিলয় নিয়ে দ্বিধাগ্রস্ত তখন শ্রীগুরুজী শ্রীনগর গিয়ে ১৮ অক্টোবর ১৯৪৭ তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করে তাঁকে সঠিক পরামর্শ প্রদান করেন যার ফলে আট দিন পরই মহারাজা বিলয়পত্র স্বাক্ষর করেন।

আবার, ভারত-চীন যুদ্ধের এগারো বছর আগেই ১৯৫১ সালে শ্রীগুরুজী স্পষ্টভাবে তৎকালীন সংবাদমাধ্যমগুলি জানিয়েছিলেন যে ভারত আক্রমণের প্রস্তুতি নিচ্ছে চীন। এই বিষয়ে তিনি বারবার দেশকে সাবধান করেছিলেন কিন্তু দুঃখের বিষয় ভারত সরকার তাঁর পরামর্শ গ্রহণ করেনি। সেই সময়ই তিনি ভারতের পারমাণবিক বোমা তৈরির পরামর্শ দিয়েছিলেন কিন্তু সেই পরামর্শও অনেক পরে ভারত সরকার গ্রহণ করেছিল। দেশের মধ্যে দেশদ্রোহী কমিউনিস্ট এবং পাকিস্তানপন্থী বিশ্বাস-ঘাতকদের উপস্থিতি ভারতের সুরক্ষার জন্য কতটা বিপজ্জনক সেই বিষয়ে তিনি বারবার বিভিন্ন ভাষণে, লেখায় দেশবাসীকে সতর্ক করেছিলেন। তাঁর ভাষণের সংকলন 'চিন্তা চয়ন'-এ তিনি বিস্তারিত ভাবে সাংস্কৃতিক জাতীয়তার বৈশিষ্ট্য, প্রাসঙ্গিকতা ও বর্তমান সময়কালে তার প্রয়োগ সম্বন্ধে চর্চা করেছেন। হিন্দু জাতির বৈশ্বিক মিশন, ভারতের অস্তিত্ব, স্বাধীনতা ও গৌরব যে তার নিজের জন্য নয় বরং বিশ্বমানবতার জন্য; জাতির আত্মার আহ্বান প্রতিক্রিয়া নয় পুনরুত্থান, সঙ্ঘকাজের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য এবং সর্বোপরি মাতৃভূমির বিশাল পরিকল্পনা ও জাতীয় জীবনে বীর্যের প্রয়োজন সম্বন্ধে তিনি বিস্তারিত ব্যাখ্যা করেছেন। তাঁর ভাষণে ইউরোপীয় দৃষ্টিতে 'ভৌগোলিক জাতীয়তাবাদ' যা একটি নির্দিষ্ট ভূখণ্ডভিত্তিক এবং ভারতীয় দৃষ্টিতে 'সাংস্কৃতিক জাতীয়তা' যা সংস্কৃতি-ভিত্তিক— দুইয়ের পার্থক্য ও বৈশিষ্ট্য তিনি অত্যন্ত স্পষ্টভাবে ব্যাখ্যা করেছেন। আচার্য স্বামী প্রণবানন্দ এবং শ্রীগুরুজী উভয়ই দেশবাসীকে শিখিয়েছেন বলিষ্ঠ সাংস্কৃতিক জাতীয়তাবোধ, অস্পৃশ্যতা প্রভৃতি ভেদাভেদ দূরীকরণের দ্বারা হিন্দুসমাজকে ঐক্যবদ্ধ করার সংকল্প এবং সংগঠন কুশলতা। এই দুই মনীষী যথাক্রমে ভারত সেবাশ্রম ও রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক, এই দুই সঙ্ঘকে কুশলভাবে নেতৃত্ব প্রদান করেছিলেন এবং জাতীয় পুনরুত্থানের বাহনরূপে গড়ে তুলেছিলেন।

উভয়ই রাজনীতি থেকে নিজেদের দূরে রেখেছিলেন, যদিও রাজনীতি সচেতন ছিলেন এবং জাতীয় জীবনে রাজনীতির গুরুত্ব অনুধাবন করে তাঁরা সেখানে যোগ্য নেতৃত্ব তৈরির বিষয়ে চিন্তা করেছিলেন। স্বামী প্রণবানন্দজী রাজনৈতিক ক্ষেত্রে আশীর্বাদ করেছিলেন ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়কে। তিরিশের দশকে মুসলিম লিগের দাপটের সামনে লড়তে তিনি তাঁকে অনুপ্রেরণা দিয়েছিলেন, যার পরিণামস্বরূপ সম্পূর্ণ বঙ্গপ্রদেশের পাকিস্তান ভুক্তির পরিকল্পনা ব্যর্থ করে পশ্চিমবঙ্গ নামক বঙ্গের এক-তৃতীয়াংশ হিন্দু বাঙ্গালির আশ্রয়স্থল রূপে আত্মপ্রকাশ করল। আবার পরবর্তীকালে স্বাধীনোত্তর ভারতে জাতীয়তাবাদী বিকল্প গড়ে তুলতে শ্রীগুরুজীও সেই শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়কেই সাহায্য করলেন, যা আজকে দেশের সর্ববৃহৎ রাজনৈতিক দলে রূপান্তরিত হয়েছে। স্বামী প্রণবানন্দ যেমন হিন্দু মিলন মন্দির, হিন্দু রক্ষী দল গড়ে তুলেছিলেন, শ্রীগুরুজীর নেতৃত্বে সঙ্ঘের বিভিন্ন আনুষঙ্গিক সংগঠন গড়ে ওঠে যা আজ স্ব-স্ব ক্ষেত্রে নেতৃত্ব প্রদান করছে।

আজ যখন ভারত আবার তার নিজের ঐতিহ্য সম্বন্ধে সচেতন হচ্ছে, যখন যুবসমাজ একদিকে নিজেদের শিকড়ে প্রত্যাবর্তন করছে, অপরদিকে বিজ্ঞান, প্রযুক্তি ও অর্থনীতিতে দেশকে এগিয়ে নিয়ে যাবার স্বপ্ন দেখছে, তখন এই দুই মনীষীর জীবন ও বাণী আরও প্রাসঙ্গিক হয়ে উঠেছে। স্বামী প্রণবানন্দ ও শ্রীগুরুজী দেশের দুর্দিনে দেশগঠনের কাজে ব্রতী হয়ে সাংস্কৃতিক জাতীয়তার চিরন্তন ধারাকে পুষ্ট ও সমৃদ্ধ করেছেন। আজকে আমরা যখন তাঁদের জীবনের বিষয় পড়ি ও শুনি, তাঁদের বাণী পড়ি, তখন তাঁদের মধ্যে চিরকালের ভারতের সনাতন আদর্শকে অনুধারণ করতে পারি।

রামনবমী উপলক্ষ্যে সেজে উঠছে রামমন্দির

রামলালার জন্য ৫৬ ভোগ, দর্শনার্থীদের জন্য বিশেষ চমক

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ অযোধ্যার রাজা দশরথ ও তাঁর প্রথমা রানি কৌশল্যার পুত্র রাম। মর্যাদাপুরুষোত্তম ভগবান শ্রীরামচন্দ্র শুধুমাত্র রামায়ণ বা পুরাণে বর্ণিত একটি চরিত্র নয়, হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের কাছে রাম হলেন ঈশ্বর, পরম পূজ্য। ভারতীয়দের হৃদয়ে তিনি বাস করেন। রাজা দশরথের জ্যেষ্ঠ পুত্র রামের জন্মগ্রহণের দিনটিই রামনবমী হিসেবে পালিত হয়। শ্রীরামচন্দ্র হলেন ভগবান শ্রীবিষ্ণুর সপ্তম অবতার। ত্রেতাযুগে তিনি জন্মগ্রহণ করেছিলেন। চৈত্র মাসের শুক্লপক্ষের নবম দিনে পড়ে রামনবমী। এই বছর রামনবমী উদ্‌যাপনের জন্য প্রস্তুত হচ্ছে অযোধ্যার রামমন্দিরও। চৈত্র মাসের শুক্লপক্ষের প্রতিপদ তিথি থেকে শুরু হয় চৈত্র নবরাত্রি। এই বছর ৯ এপ্রিল থেকে শুরু হয়েছে চৈত্র নবরাত্রি। ১৭ এপ্রিল রামনবমী উদ্‌যাপন পর্যন্ত চলবে এই নবরাত্রি। নয় দিন ধরে চলবে পূজা। এবারের নবরাত্রি হতে চলেছে শ্রীরামজন্মভূমি অযোধ্যার জন্য বিশেষ। রামমন্দিরে চৈত্র নবরাত্রির প্রস্তুতি চলছে পুরোদমে।

রামমন্দিরের অনুষ্ঠানসূচি : গত ৯ এপ্রিল রামলালার দরবারে কলস স্থাপনের মাধ্যমে ৯ দিনের নবরাত্রির আচার পালন শুরু হয়। ১৭ এপ্রিল রামজন্মোৎসব উপলক্ষ্যে একটি অনুষ্ঠানেরও আয়োজন করা হয়েছে। প্রসঙ্গত, প্রায় ৫০০ বছর পর অযোধ্যায় রামমন্দিরে রামজন্মোৎসব পালিত হবে। রামমন্দিরের পুরোহিতদের মত অনুযায়ী ৯ এপ্রিল একটি রৌপ্য কলস স্থাপন করা হয় এবং তারপর ৯ দিন ধরে প্রতিদিন রীতি অনুযায়ী দেবী দুর্গার পূজা করা হবে। রামমন্দিরে চৈত্র নবরাত্রির ৯ দিনে শক্তি পূজা ও দুর্গা সপ্তশতী পাঠ করা হবে।

বহুকাল পর প্রথমবার রামমন্দিরে শ্রীরামজন্মোৎসব পালনের লক্ষ্যে বিশেষ প্রস্তুতি গ্রহণ চলছে। রামলালাকে নিবেদনের জন্য ৫৬ ধরনের ভোগ প্রস্তুত করা হবে। ভোগ নিবেদনের পর তা ভক্তদের মধ্যে প্রসাদ হিসেবে বিতরণ করা হবে।

রামনবমী উপলক্ষ্যে রামলালাকে দর্শনের সময়ও বাড়িয়ে দেওয়া হলো। এই ন'দিন রামমন্দির ১৪ ঘণ্টা থেকে বেড়ে ২০ ঘণ্টা পর্যন্ত খোলা থাকবে। প্রত্যেক দর্শনার্থী যাতে প্রসাদ পান সেই ব্যবস্থাও রাখা হচ্ছে। এছাড়াও গোটা এলাকাজুড়ে বসছে এলইডি স্ক্রিন। প্রসার ভারতীর উদ্যোগে অযোধ্যার বিভিন্ন এলাকায় রামমন্দিরে রামনবমী উদ্‌যাপনের সরাসরি সম্প্রচার করা হবে।

রামনবমীর দিনে রামমন্দিরে ভীড় আরও বাড়তে পারে বলেই মনে করছে শ্রীরামজন্মভূমি তীর্থক্ষেত্র ট্রাস্ট। তাদের তরফে জানানো হয়েছে দর্শনার্থীদের সংখ্যা সেদিন লক্ষাধিক হতে পারে। এতদিন তিনটি সারি করে ভক্তরা দর্শনের জন্য মন্দিরে প্রবেশ করতেন। এবার তা বাড়িয়ে সাতটি সারি করা হবে বলে ট্রাস্টের পক্ষে জানানো হয়েছে। □

ভুটানের সর্বোচ্চ সম্মান পেলেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ ভুটানের সর্বোচ্চ সম্মান পেলেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। গত ২২ মার্চ ভুটান সফররত মোদীজীকে ভুটানের রাজা 'ডুক গ্যালপো' সম্মানে ভূষিত করলেন। এই প্রথম কোনো বিদেশি রাষ্ট্রনেতা ভুটানের সর্বোচ্চ অসামরিক সম্মানলাভ করলেন। মোদীজী বলেন, 'প্রতিটি পুরস্কারই বিশেষ। কিন্তু যখন অন্য দেশ থেকে পুরস্কার মেলে, তখন বোঝা যায় দুই দেশই সঠিক পথে চলেছে। প্রতিটি ভারতীয়র পক্ষ থেকে আমি এই পুরস্কার গ্রহণ করছি'।

ভুটানের রাজা জিগমে খেসর নামগিয়াল ওয়াংচুক মোদীজীকে ভুটানের সর্বোচ্চ নাগরিক সম্মান 'অর্ডার অব দ্য ডুক গ্যালপো' অর্পণ করেন যা ছিল ২০২১ সালের ১৭ ডিসেম্বর ভুটানের ১১৪তম জাতীয় দিবস উদ্‌যাপনে ঘোষিত। ২০২১-এ এই পুরস্কার ঘোষণার পর ভুটানস্থিত ভারতীয় দূতাবাস থেকে একটি বিবৃতিতে বলা হয়, 'পদমর্যাদা ও প্রাধান্যের ভিত্তিতে অর্ডার অব দ্য ডুক গ্যালপো আজীবন কৃতিত্বের স্বীকৃতি ও অলংকরণ হিসেবে প্রবর্তিত হয় এবং এই পুরস্কার ভুটানের রাষ্ট্রীয় সম্মাননার সর্বোচ্চ শিখরস্বরূপ যা অন্য সমস্ত পদমর্যাদা, সম্মান, অলংকরণ ও পদকের ঊর্ধ্বে শীর্ষস্থান অধিকার করে'। ভারত-ভুটান সম্পর্কের উন্নতির ক্ষেত্রে অসাধারণ অবদান এবং ভুটানি জাতি ও জনসাধারণের প্রতি বিশেষ সেবাদানের স্বীকৃতি স্বরূপ ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে এই পুরস্কার প্রদান করা হয়েছে বলে সেই বিবৃতিতে জানানো হয়। ২০১৪ সালে ভারতের প্রধানমন্ত্রী পদে আসীন হওয়ার পর এটা মোদীজীর তৃতীয় ভুটান সফর। পুরস্কার লাভের পর তাঁর এক্স হ্যান্ডেলে লেখেন, 'ভুটানের অর্ডার অব দ্য ডুক গ্যালপো পুরস্কার প্রাপ্তিতে সম্মানিত। আমি ১৪০ কোটি ভারতবাসীকে এই পুরস্কার সমর্পণ করি'।

শিশুর বার্থ সার্টিফিকেটে বাবা ও মায়ের ধর্মের উল্লেখ বাধ্যতামূলক হতে চলেছে

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ ২০২৩ সালের আগস্ট মাসে সংসদে পাশ হয়েছে জন্ম-মৃত্যু নথিভুক্তকরণ সংক্রান্ত সংশোধনী আইন। এই আইন অনুযায়ী জন্মের নথিভুক্তকরণ প্রক্রিয়ায় এবার বাধ্যতামূলক হতে চলেছে পিতা-মাতার ধর্মের নথিভুক্তি। এতদিন শুধুমাত্র পরিবারের ধর্মের উল্লেখ করতে হতো। এবার থেকে মা ও বাবার ধর্ম আলাদা আলাদাভাবে উল্লেখ করতে হবে।

কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক শিশুদের জন্মের নথিভুক্তীকরণের ক্ষেত্রে নতুন নিয়ম এনেছে। এবার থেকে ধর্মের উল্লেখও করতে হবে জন্ম নথিভুক্তীকরণের ক্ষেত্রে। এই তথ্যের ভিত্তিতেই ন্যাশনাল পপুলেশন রেজিস্টার, ভোটার তালিকা, আধার কার্ড, পাশপোর্ট, ড্রাইভিং লাইসেন্সের তথ্য সংগৃহীত হবে বলে ভাবনা চিন্তা করছে কেন্দ্রীয় সরকার। ২০২৩ সালের আগস্ট মাসে পাশ হওয়া এই আইন অনুযায়ী জন্ম-মৃত্যুর তথ্য আপডেট করা হবে এবং কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে এই তথ্যভাণ্ডার থাকবে। নতুন আইন অনুযায়ী জন্ম-মৃত্যুর তথ্য কেন্দ্রীয় সরকারের সিভিল রেজিস্ট্রেশন সিস্টেম পোর্টালে ডিজিটাল পদ্ধতিতে রেজিস্টার করাতে হবে। এই পোর্টাল থেকে পাওয়া ডিজিটাল বার্থ সার্টিফিকেট ব্যবহার করেই স্কুলে ভর্তি থেকে শুরু করে যাবতীয় সরকারি পরিষেবা পাওয়া যাবে।

কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের অধীনে রেজিস্ট্রার জেনারেল অফ ইন্ডিয়া সব রাজ্য সরকারগুলিকে এ বিষয়ে অবহিত করবেন। রাজ্য সরকারগুলি নতুন নিয়ম সরকারিভাবে গ্রহণ করার পর শিশুদের জন্মের রেজিস্ট্রেশনের এই নতুন প্রক্রিয়া বাস্তবায়িত হবে।

R. K. WIRE PRODUCTS LTD.

Manufacturers of Wire and Wire Products

Office : Unit No-VII, 15th floor, Tower-I
PS Srijan Corporate Park
Plot No. G-2, Block-EP & GP, Sector-V
Salt Lake City, Kolkata-700 091
(West Bengal) India

With Best Compliments From -

A

WELL WISHER

(A.B.)

With Best Compliments From :

Wadhwana

"Park Center"
24, Park Street, Kolkata - 700016
Phone :2229-8411/1031/4352,
Ph. 2229-0492
e-mail : wadhwana@vsnl.com

With Best Compliments From :

LEADSTONE INTERNATIONAL LLP.

19, R. N. Mukherjee Road,
1st Floor, Kolkata 700 001
Ph. +91 33 2248 1789/ 1790
Email : leadstone.intl@gmail.com

With Best Compliments From :-

Rajesh Kankaria

AJAY APPARELS

Office :
155B, Rabindra Sarani
3rd Floor,
Kolkata-700007
Ph. 033-2272 7030